যক্ষ

কিন্নর রায়

এ ১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ · জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রজ্ঞা প্রকাশনের পক্ষে অরূপ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার ও অতনু পাল কর্তৃক এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত ও নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

বাবু কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

কাছেই নরক
প্রকৃতি পাঠ
অন্ধকারের ছবি
আগুনের সিঁড়ি
নিরপেক্ষ
মেঘপাতাল
সংঘর্ষ
সংখ্যালঘু

গল্প সংকলন

রথযাত্রা
অন্যধারার গল্প
ধর্মসংকট
কুয়াশাওয়া ভিজে যাচ্ছে
এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার

ছোটদের জন্য

আলেকজান্ডারের বর্শা
টুলকির বই

রম্যরচনা

লুপ্তজীবিকা
কলকাতার পাখি পোষা মাছ ধরা

এই ডোরিক স্থাপত্যের প্রাচীন চারতলায় আলো চলে গেলে খোপে খোপে মিনি জেনারেটর জেগে ওঠে। কাঠের উঁচু উঁচু সিঁড়ি, তার দুপাশে ধরে ওঠা-নামার রেলিং। কোনো কোনো খোপ থেকে উপচে আসা টিউব-জ্যোৎস্নায় সিঁড়ি আলো পেয়ে যায়। পুরোটা নয়। পাশে রেলিং আর দেয়ালের গায়ে লেগে থাকে লোডশেডিং-আঁধার।

মিনি জেনারেটর শব্দ আছে, ধোঁয়া। সবাই নিজের নিজের খোপে আলোয়, ফ্যানে থাকতে গিয়ে ডিজেলে জেগে ওঠা জেনারেটরে ভরসা রাখে। কাঠের পার্টিশন তিনতলার এই বিশাল হলটিকে দুভাগ করেছে! সামনের ফালিটিতে কাচঘেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার, অটোমেটিক ক্যানন জেরক্স, পবনপুত্র ডে অ্যান্ড নাইট ক্যুরিয়ার সার্ভিস।'

কাচের সুন্দর ঘর। কাচের দেওয়াল, কাচের দরজা। একটা ঢালাই লোহার পুরনো সিঁড়ি আছে। তার গায়ে লতাপাতা ফুল—নকশায়। অনেকটা যেমন ফুল-ঘাটে খিলানের গায়ে ফুটে থাকা ডিজাইন।

জেরক্স, ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার বন্ধ হয়েছে একটু আগে। সুসান জর্জ কিছু আগেও জেরক্স, ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের কাউন্টার সামলাতে ব্যস্ত ছিল। এখন তার ডিউটি পবনপুত্র ক্যুরিয়র সার্ভিস-এর। পীযূষ চলে গেছে ঠিক সাতটায়। সে রকম আর্জেন্ট জেরক্স করানোর কেউ এলে সুসান সামলে নেবে।

মেহগনির তিনটি পায়াঅলা এই টেবিল টপে শ্বেতপাথর। তার গায়ে আঁকা দাবার ছক। একটি ডোকরা অ্যাশপট থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। তিলক টুং টাং শব্দ তোলা বিদেশি লাইটারের আগুনে নতুন সিগারেটে যেতে চাইছিল। জেনারেটর জেগে উঠলে

এ সি থাকে না। তিলকের বড় কষ্ট। অনবরত ঘামে তার পাউডার-মাখা লালচে শরীর ভিজে উঠতে থাকে। হাঁটু ছাড়ানো দড়ি বাঁধা হাফ প্যান্টের নানা রঙ-বেরঙে জেনারেটরে চলা টিউবের আলো তেমন করে বসে যেতে পারে না। তিলকের ঘাড়, পিঠ, বুকের ঘাম নাভি হয়ে উরুতে নেমে আসে।

ঘামের গন্ধ সহ্য হয় না তিলকের। একবার অডিকোলেন স্প্রে করেছে আধঘণ্টা আগে। তার ফিকে সুঘ্রাণ এখনও শরীর জুড়ে, এ-ঘরের বাতাসে। তবু তিলকের মনে হচ্ছিল, আবারও ফরাসি সুরভির কাছাকাছি যেতে। সুরভিতে শরীর-মন তাজা থাকে। টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার রেখে তিলকের কিছু ঠাণ্ডা খাওয়ার কথা মনে পড়ল। এই গরমে চিলড্ বিয়ার চলতে পারে, সঙ্গে দু-এক টুকরো ফ্রুটস্। ফিশ ফিঙ্গার। এক-আধটা কাজু। তবু একা একা বিয়ার পানে তিলকের ক্লান্তি আসে। বড় করে কোল্ড ড্রিংকস্ খাওয়া যেতে পারে, এক সঙ্গে দুটো। বা একটাই মহা-ডাবল। যে ঝাঁঝালো ঠাণ্ডা পানীয়টি তিলকের পছন্দ, তার মধ্যে ক্লোরোস্টরেল বেড়ে ওঠার বীজ লুকিয়ে, এমনটি জানার পর দিনের মধ্যে যখন-তখন কোল্ড ড্রিংকসে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। আয়ুর জন্যে কত কি দাঁড়ি, কমা মেনে নিতে হয়। তবুও কি নিরাপদ বৃত্তে ঘোরাফেরা করা যেতে পারে! এত চেকআপ, ওষুধ, মেডিকেল বুলেটিনের পরও তো মৃত্যু আসে ধীর পায়ে। এই ছত্রিশে তিলকও তো কিছুটা ইসকিমিক হার্ট, রক্তে চিনি, ক্লোরোস্টরেল। এত কম বয়সেও শরীর ঘিরে হাইপার টেনশন—সভ্যতা যা যা অসুখ মানুষকে দিতে পারে। এমন ভাবনার সঙ্গে দামি সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে যায় শ্বাসে। কাশি উঠে আসে।

মাথার ওপর অবিরাম বাতাস বয়ে দিয়ে যাওয়া দুটি ফ্যানের ব্লেড, একটি স্থির। জেনারেটরে গতি পায় একটাই পাখা। এত উঁচু, কড়ি-বরগা দেয়া ছাদ থেকে হাওয়া নামার জন্যে ফ্যানের লোহার ডাঁটিটি বেশ লম্বা।

বিশাল এই ঘরের মেঝেতে পুরু, দামি কার্পেট। দেয়ালে অরিজিন্যাল হুসেন, গণেশ পাইন, যামিনী রায়। যেহেতু ঘরটি বড়, তার দেয়ালে ছবি, তাই আলো-পাখার নানান খুচরো বন্দোবস্ত। ছবি দেখার জন্যে। ছবি নিয়ে কথা বলার জন্যে। সে সব আলো কখনও কখনও জোনাল লাইটের মর্যাদাও বুঝি পেয়ে যায়। যেমনটি অনেক সময় থিয়েটারের স্টেজে। দেয়ালের অফ হোয়াইট সুষমায় এই সব ছবি, এই আলো, এই অন্ধকার। তিলক তার পুড়ে শেষ না হয়ে যাওয়া সিগারেটের অনেকটাই ডোকরা অ্যাশপটের হাঁয়ে মুচড়ে বসিয়ে দিল। তারপর সামনের ধোঁয়া—যা বন্ধ হাওয়ায় ঝুলে ছিল, তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল।

বড় ঘরের পর দেয়াল আছে,ইটের এইটুকু লাল রঙ জেগে থাকে, অফ হোয়াইটের গায়ে। তার গায়ে ফরাসি স্যাণ্ডেলিয়র—ঝাড়। গায়ের পোর্সিলিন উজ্জ্বলতায়,সোনালি মিনা-র মুগ্ধতায়। উত্তর কলকাতার কোনো রাজ পরিবারের বৈভব বুঝি ফুটে আছে। পাশাপাশি দুটি ঝাড়ের গায়ে জড়ানো আঙুরলতায়, থোকা বেঁধে ঝুলে থাকা আঙুরে সোনালি রঙ। এই জোড়ার একটির গোটা-তিনেক পাতা নেই।

ঝড়ের নীচে একটি কাচের সেলার। এটিও কোনো বড়বাড়ির বাবুর সুরাপ্রীতির স্মৃতিচিহ্ন। সেলারটি ফাঁকা। তার মাথায় বসানো একটি কাচের ঈগল। সবুজ। পাশেই একটি কাচের বোতল, প্রায় তিন ফিট লম্বা। ঝাড়ের মাথার ওপর চার ব্লেডের একটি পাখা। তার চারটি ব্লেডে খয়েরি আর সোনালিতে নকশা। ডি সি-তে চলা এই ফ্যান ইলেকট্রিকের টানে চলতে শুরু করলে এ-বাড়ির কড়ি-বরগা কেঁপে ওঠে। হাওয়ার জন্যে নয়, শুধুই অ্যাণ্টিক-মহিমায় চার ব্লেডের ফ্যানটি এ-ঘরের আকাশে ঝুলে থাকে।

ইট দিয়ে নতুন এই যে দেয়াল, ফলে ওপাশে রাস্তার দিকে

বারান্দার আগে একফালি বেডরুম বের করে নিতে পেরেছে তিলক চৌধুরী। এ-বাড়িতে নতুন কোনো রকম কনস্ট্রাকশান বে-আইনি। দাবোয়ান,কেয়ার-টেকাবদের প্রতি মাসেই কিছু দিয়ে থাকে তিলক। তাই তার জন্যে যে কোনো সময়লিফটের দরজা খুলে যায়।

লাল দেয়ালের বাঁদিকে যে সবু প্যাসেজ, সেখানে দুটি বাথরুম, ইউরিন্যাল, শাওয়ার, কমোড। তার পাশ দিয়ে ঢালাই লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। কাঠের মাচা-করা একটি স্পেস, সেখানে তিলক চৌধুরীর অ্যাড এজেন্সি—কার্নিভাল। ওখানে গোটাদুই টেবিল আছে। খানচারেক চেয়ার। সুবিমল বক্সি এখনও কাজ করছে। একটা লোগো। কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না তিলকের। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে দুবছর ছিল তিলক। কোর্স কমপ্লিট করেনি। সুবমিল তার এজেন্সির বারোশ টাকা মাইনের পেস্টার-কাম-চিফ আর্টিস্ট, তিলক ভিসুয়ালাইজার। পরিবেশের ওপর একটা লোগো। সরকারি কাজ। জমা দেবে অনেকেই। তিলক ভাবছিল গ্লোবের মাথায় একটি সবুজ পাতার মুকুট। সে আই-ডিয়াটা সুবিমলকে বলেছিল। সুবিমল ফিনিশ করছে। এখনও তার পছন্দের হয়ে উঠতে পারেনি।

কার্নিভাল অ্যাড এজেন্সির খুপরি থেকে একফালি আলো ছিটকে এসে পড়েছে বাথরুমের সামনে। সেখানকার পাপোশ, কার্পেটের কোণা একটু ভেজা মতো। পায়ে পাতলা সোলের কোলাপুরি থাকায় তিলক টের পেল না। কিন্তু আবছামতো আলোয় ভিজে আর শুকনোর সীমারেখাটি বড় স্পষ্ট। হয়ত গম্ভীরও।

তিলক দেখতেই পাখানি ক্যুবিয়ার সার্ভিস, অটোমেটিক জেরক্স, ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের খোপের ভেতর থেকে ডগি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় গোল্ডেন রিট্রিভারের গন্ধ। সাড়ে তিন বছরের ডগির পেছনে গোল্ডি, তারপর রকি। রকির গায়ের লোম এখনও তেমন করে বেড়ে ওঠেনি। সোনালি হতে আরও

সময় লাগবে। বয়েস সাত মাস। গোল্ডি দেড় প্লাস।

অনেকখানি জায়গাঅলা বড় ঘরে জেনারেটরের টিউব আলো তেমন করে অন্ধকার সরাতে পারেনি। তাই তিনটি পুরুষ কুকুরের ছায়া আলাদা আলাদাভাবে এ-ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে। ছায়া দেখে কুকুররা চিৎকার করে ওঠে। তাদের গম্ভীর গলায় গোটা ঘর গমগম করে ওঠে। ডগির সন্তান গোল্ডি। গোল্ডির ছেলে রকি। পাশাপাশি তিনপুরুষ এ ওর ল্যাজ নিয়ে কামড়ে ধরতে চায়। তারপর আবার ডেকে ওঠে।

নিজের কুকুররা বাবা হলে তিলক ফিজ পায়। সঙ্গে একটি বাচ্চা। সে ডগ পছন্দ করে।

স্টপ। স্টপ। রকি গোল্ডি ডগি। তিলক একটু জোরেই চেঁচিয়ে ওঠে।

মাথা নিচু করে ডগি, রকি, গোল্ডি অন্ধকারে মিশে যেতে চায়। গোটা ঘরজুড়ে একটা কুকুর কুকুর গন্ধ জেগে থাকে। ক্যুরিয়ার সার্ভিস-এর অন্ধকারে, যেখানে হয়ত জেরক্স মেশিন, ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের গায়ে এখনও এয়ার কণ্ডিশনারের শীতলতা ছড়িয়ে আছে, সেখানে ডগি, গোল্ডি, রকি আরাম খোঁজে।

তিলকের মনে পড়ল গরম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডগি আর গোল্ডির লোম ছাঁটাই করা উচিত। এখনও করানো হয়নি। তাদের খাওয়া, লোম ভিজিয়ে চান করানোর টাটার শ্যাম্পু, ভিটামিন ক্যাপসুল, গায়ে মাখার পাউডার—সব মিলিয়ে মাসে মাথাপিছু এক হাজার করে, মোট তিন হাজার।

স্যার, মে আই গো? সুসান দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের ওপারে। ছাইরঙা স্কার্টের নীচে তার স্বাস্থ্যবতী উরু, আঁধারে প্রায় মুছে গেছে। শ্যামলা রঙে যে হালকা হালকা রোমবাহার, তাতে অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ব্যবহারের চিহ্ন। সুসান হাসলে তার সাজানো দাঁত চোখে পড়ে। ঠোঁটে ন্যাচারাল কালার লিপস্টিক।

এখন চৌকাঠের ওপরে, অন্ধকারে মুখ মুছে গেছে। শ্যাম্পু করা পনি টেল ঘামে জড়িয়ে লেগে আছে ঘাড়ের সঙ্গে। তেমন লম্বা নয়। স্কার্টের ওপরে শার্টও নরম রঙের।

দরজার ফ্রেমে সুসান ওয়াসিম কাপুরের কোনো ছবি হয়ে আটকে ছিল। শাদা নিউকাটটি ফুটে উঠছিল অন্ধকারে। তিলক ঘুরল। চেয়ারের পিঠ থেকে তোয়ালেটি নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর—ইয়া, শুধু এই শব্দটুকু হাওয়ায় ভাসিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটি তুলে নিল টেবিল থেকে। 'ইনজুরিয়াস টু হেলথ' লেখাটিতে আলো পড়েছিল।

সুসান দরজার ফ্রেম থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন ও লিফট পেয়ে যাবে।

সুবিমল কাঠের ওপরতলা থেকে নেমে এল। সরু প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি।

স্যার, লে-আউটটা একটু—

পৃথিবীর মুখে ধূসরমতো বিষাদের ছায়া। মাথায় সবুজ পাতার মুকুট। ফিনিশ করেছে সুবিমল।

চল, তোমার ঘরে যাই। বলতে বলতে তিলক ঘোরানো সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল।

কাচ-ঢাকা টেবিলের ওপর টেবিল-আলো। সেখানে সুবিমলের করা লোগোটি দেখতে দেখতে তিলক বলল, ঠিক আছে। কাল এটাকে স্টুডিওতে পাঠিয়ে একটা নেগেটিভ করে নিও। তারপর টাচ দিয়ে ফিনিশ করে, ব্রোমাইড প্রিণ্ট তুলে—

ততক্ষণে প্রফুল্লর রান্না করা মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এই খুপরির হাওয়ায়। ক্যুরিয়ার সার্ভিস, জেরক্স মেশিন আর ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের মাথায় কাঠের পাটাতনে কিচেন। সেখানে প্রফুল্ল দাস গ্যাসের আগুনে মশলামাখা মাংস কষে নিচ্ছিল। দাদাবাবু—তিলক একটু মশলা বেশি খায়।

কার্নিভাল অ্যাড এজেন্সির টেবিলে কাচের ওপর টেবিল

ল্যাম্পের আলো। কাচের নীচে অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড, শাদা-কালো, রঙিন ছবি। সেই আলোয় সুবিমল বক্সির করা লোগোটি দেখতে দেখতে তিলক মাথা নাড়ছিল।—না, ঠিকই আছে। এখন নেগেটিভ করে, কয়েকটি ব্রোমাইড প্রিন্ট নিয়ে তার ওপর ফিনিশ করে পার্টিকে দেয়া দরকার।

সুবিমল বলল, স্যার, আজকের মতো আমি—

তুমি চলে যাও—তিলক লোগোর ওপর থেকে চোখ না তুলেই বলল।

দুই

তিলক ঘুম থেকে উঠে পড়ে সাতটায়। ঠিক নটায় সুসান এসে যায়। সাড়ে নটায় পীযূষ। সুবিমলের আসতে আসতে দশটা, সাড়ে দশটা। হলুদ দিয়ে ফোটানো মাংস আর ভাত কলাইকরা থালায় ডগি, গোল্ডি, রকির জন্যে বেড়ে দিয়েছে প্রফুল্ল। আলাদা আলাদা থালায় খেতে খেতেও মাঝে মাঝেই গরগর, গরর্ করে উঠছে ওরা, নিজেদের ভেতর। এখন সবে নটা বেজেছে। কাউণ্টারে বসে গেছে সুসান। প্রফুল্ল আজ বাড়ি যাবে। ফিরবে পরশু। এ দুদিনের জন্যে তিলক, ডগি, গোল্ডি, রকি আর তার অফিস দেখাশুনো করবে প্যায়রেলাল—লিফটম্যানের ছোটছেলে।

বাতাসে গরম মিশে আছে। দু-দুটো ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরছে মাথার ওপর। তবু তিলক চৌধুরী ঘেমে উঠছে। একটু আগে ফ্রি-হ্যাণ্ড একসারসাইজ করেছে। হাতে ধোঁয়া-ওড়ানো সিগারেট নিয়েই ডাকল—প্যায়রেলাল, প্যায়রেলাল—

হুজৌর।

আজ বিকেলে ডগি, গোল্ডি, রকিকে নিয়ে বেড়াতে যাবি। যেন ভুল না হয়। প্রফুল্ল থাকছে না।

জি হুজৌর।

তিলক হাতের ঘড়ি দেখছিল। সাড়ে দশটায় গোটা তিনেক যামিনী রায় নিয়ে আসার কথা দাসবাবুর। গোপাল দাস। যদি পছন্দ হয় আর দরে পোষায় তিলক রাখবে। তারপর সুযোগ বুঝে কোনো পার্টিকে। যামিনী রায়ের ছবি এখন খুব ভালো দাম পাচ্ছে। যদি ফেক্—নকল না হয়। অরিজিন্যালের পাশাপাশি ফেক্ও চলছে খুব। ওঁর ছেলে পটলের আঁকা।

ডোকরার অ্যাশপটে সিগারেটের অগ্নিমুণ্ড ঠেসে ধরে, আঙুলের চাপে মুচড়ে বসিয়ে দিতে দিতে তিলকের ইচ্ছে হল জেরক্স-ঘরে এয়ারকণ্ডিশান মেশিনের শীতলতায় নিজেকে একটু ঠাণ্ডা করে আনতে। শাদা সুতির পাজামার ওপর খুব হালকা ঘি রঙের হ্যাণ্ডলুম পাঞ্জাবি। পায়ে পাতলা সোলের বাড়িতে পরার কোলাপুরি।

তিলককে দেখেই পীযূষ উঠে দাঁড়াল।

বোসো, বোসো।

আজ কাজ কীরকম ?

তেমন চাপ নেই স্যার। পীযূষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাব দিল।

এই আনুগত্যে তিলক মনে মনে খুশি হয়। তাদের উত্তর কলকাতার বড় বাড়ির ঐতিহ্যে, যা কিনা নীলরক্ত বলে চিহ্নিত ছিল একদা, এই দাস্যটুকু উপভোগের। আবার আধুনিকের, গণতন্ত্রের এই মহিমায়—যেখানে জমিদারি নেই, সেখানে পীযূষকে বসে পড়তে বলায় তিলকের মনে হল এই উদারতাটুকু প্রয়োজনীয়।

আমি চিৎপুর রোডের ওপর সেই বিশাল বাড়িটা দেখেছি। ও-বাড়িতে আমার জন্ম নয়। তবে আমার দুই দাদা উত্তরের ঘরে হয়েছেন, দাইয়ের হাতে। তাঁদের একজন ও-বাড়িতেই থাকেন। আর একজন থাকেন নিউ আলিপুরে। তিনি ক্যালকাটা ক্লাবের স্টুয়ার্ড। ও-বাড়ির বিশাল অশবত্থ গাছটার নীচে বাবার নাড়ী পোঁতা আছে। আমার দুই দাদারও। ছোটভাই সন্দীপ, আমি আর একেবারে ছোটবোন মধুরা—যে কিনা বিয়ের পর

কানাডায় সেটেলড, আমরা সবাই নার্সিং হোমে। ওই অশবত্থ গাছের ছায়ায় আমাদের কারও নাড়ী পোঁতা নেই।

জেরক্সের আলো দেয়া মেশিনের সামনে নিজের বাবা শশাংকশেখরকে হঠাৎ যেন মনে পড়ল তিলকের। প্রায় সাত ফিট লম্বা, গায়ে পুরো হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি, সরু কালোপাড় কোঁচানো ধুতি, মিলের। একদিনের বেশি একসেট ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন না। ডবল ঘরের পাঞ্জাবিতে মুক্তোর বোতাম। ডান হাতের অনামিকায় চার রতির একটি হিরে। পায়ে কালো রঙের চটি। মুখে সিগারেট, সবসময়।

মাথার পাতলা-হয়ে-আসা চুল, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখে বাবা যখন ছবির ওপর ঝুঁকে পড়তেন বা অন্য কোনো আর্ট অবজেক্টের ওপর, তার ফর্সা কপালের বাঁদিকে একটি নীল শিরা ফুলে উঠত। কপালে পরিষ্কার তিনটে ভাঁজ। জমিদারি চলে যাওয়ার আগে থেকেই বাবা অ্যান্টিক কিনছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, জোঁড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুভো ঠাকুর—যিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের নাতি—কলকাতার বিখ্যাত শিল্পবোদ্ধা, কালেকটার, তাঁর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল বাবার।

শশাংকশেখর বলতেন, সুভোদার কাছে আমরা শিখেছি, কালেকটারের আসল জিনিস হচ্ছে চোখ। আর তখনই দরজার ফ্রেমে খবরের কাগজে মোড়া ছবি হাতে গোপাল দাস ভেসে উঠল। আর তার পেছনে ডগি, গোল্ডি, রকির গমগমে গলা।

বেঁটেখাটো গোল চেহারা। প্যান্টের ভেতর গুঁজে-পরা ফুল হাতা শার্ট। হালফ্যাশনের সরু বেল্ট। পায়ে চামড়ার দামি শু। মাথায় মাড়োয়ারি ক্যাপ। গোপালের চুল ইদানীং বড় তাড়াতাড়ি পড়ছে। তাই ছাই রঙের টুপিটি। তাবার এ ধরনের টুপিতে নিজেকে অনেকটা অবাঙালি করে তোলা যায়। গোপাল তা মনে রেখেছে। তার কাছ থেকে জিনিস কেনার পার্টি অধিকাংশই মাড়োয়ারি।

স্টপ। স্টপ ডগি রকি গোল্ডি! গোপালবাবু তো চেনা লোক। তিলকের এক ধমকেই কাজ হল।

দালালদের মুখে এক ধরনের বিগলিত হাসি সাজানো থাকে। গোপাল তেমনই একটা ছবি নিজের মুখে টাঙিয়ে রাখতে পেরেছিল। এ হাসি অনেক সময়েই গা-জ্বালানিয়া হয়ে ওঠে তিলকের কাছে। তবু বেশির ভাগ সময় চুপ করে যেতে হয়।

বাব্বাঃ, বাসে যা ভিড়। নিজেকে সোফার ওপর ছেড়ে দিতে দিতে গোপাল বলল। সেই গোপালনগর থেকে আসা। অফিস-টাইম পড়ে গেছে। শেষ অব্দি চেতলা-বাগবাজার মিনিবাসে।

একটা ট্যাক্সি করলে পারতেন। ডিলিং হলে টু থেকে থ্রি পারসেন্ট তো আপনার বাঁধা। এত টাকা খাবে কে দালালবাবু?

তিলক মাঝে-মাঝেই গোপাল দাসকে দালালবাবু বলে ডেকে ওঠে। গোপাল বুঝতে পারে। কিন্তু গায়ে মাখে না। মাল বেচতে গেলে অনেক কথাই মুখ বুজে শুনে যেতে হয়।

দেখি, ছবিটা খুলুন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে তিলক ঘরের টিউব ল্যাম্প জ্বেলে দিল। দেয়ালে ফ্রেমবন্দি শশাঙ্ক-শেখর এই টিউব-আলোয় কাচের আড়ালে বুঝিবা সামান্য ঝলসে উঠলেন। চেমল্ড থেকে বাঁধানো সোনালি ফ্রেমে, কাচের আবরণে আলগা ধুলো। ছবির কপালে শাদা চন্দনের ফোঁটা। গলার মালাটি ফ্যানের হাওয়ায় শুকিয়েছে। আজ ওড়িয়া ঠাকুরমশাইটি এসে মালা বদলে দেবেন। ভেতরে, আমার শোয়ার সিঙ্গল খাটের পাশের টেবিলে মা-বাবার যৌবনের ছবি। তারও গলায় মালা পড়বে। কুলুঙ্গির পাথরের গণেশে কুচো ফুল, চন্দন। একটি মালা। এ বাবদ ঠাকুরমশাইকে মাস গেলে একশ দিতে হয়। প্রসাদ হিসেবে দুখানা বাতাসা, কখনও বা ভাঙা সন্দেশ, গুজিয়া। রোজ।

ছবির শশাঙ্কশেখর সামনে তাকিয়েছিলেন। তাঁকে সুভো ঠাকুর শিখিয়েছিলেন নানান ডিজাইনের দোয়াত, পারফিউম আর

ওয়াইন বটল, কাঁথা, বালুচরী, ছোট মূর্তি, পট আর তামাক খাওয়ার নানা জিনিস কীভাবে জোগাড় করতে হয়। গোটা জীবন তাই করে গেছেন। শেয়ার বাজারে কিছু ইনভেস্টমেণ্ট ছিল। জমিদারি বিক্রি, ক্ষতিপূরণের টাকা ছিল। আর ছিল শিল্প সংগ্রহের নেশা।

হিন্দি খবরের কাগজের পাতা দিয়ে মোড়া ক্যানভাসে তেল রঙের যামিনী রায় ধীরে ধীরে সামনে এল তিলকের। হালকা ওশান ব্লু-র ব্যাকগ্রাউন্ডে তিনটে বেড়াল, যেমনটি যামিনীবাবুর ছবিতে থাকে। একেবারে বিশুদ্ধ দেশি ফর্ম। আর একটি ছবিতে লম্বা প্যানেলে সাঁওতাল নাচিয়েরা। দুটি ছবিতেই যামিনীবাবুর সই রয়েছে, তিলক ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়েছিল।

অমিয়, মানে পটলের আঁকা নয় তো? দেখবেন মশাই।

আরে না না, জেনুইন।

এত জেনুইন যামিনী রায়, নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর কোথায় পাচ্ছেন বলুন তো গোপালবাবু? বলতে বলতে সিগারেটে চলে যেতে পারে তিলক চৌধুরী। তামাকের ধোঁয়া ছড়িয়ে যায় ঘরের বাতাসে।

নিন, সিগারেট খান। বলতে বলতে প্যাকেট আর লাইটার এগিয়ে গোপাল দাসের দিকে।

প্যাকেট থেকে সিগারেট নিতে নিতে গোপাল দাস দালালসুলভ বিনয়ের হাসিতে বিগলিত হতে হতে—কি যে বলেন বাবু—বলতে বলতে, একঝলক ধোঁয়া নিজের ভেতরে নিয়ে, তা বাইরে বের করে দিতে দিতে, আপনাকে ফেক্ জিনিস দেখাব—আমার ক্ষমতা আছে? প্রফেশনাল বিনয়ে একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে গোপাল দাস—এ কথা কটি বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে।

গোপালের এই পেশাদারি খেলা জানে তিলক। তাকে 'বাবু' বলে পুরনো ফিউডাল মেজাজটি উসকে দিয়ে বার্গেন না করেই দু-এক হাজার যদি—

ছবি রেখে যান। একটু দেখেনি। তারপর—

পার্টির তাড়া ছিল বাবু।

বলতে বলতে সিগারেটে একটা বড় করে টান দিয়ে ফেলে গোপাল।

আজ কিছু করতে পারব না।

একটু দেখুন। দুটো ছবি তিরিশ, প্রায় জলের দরে। এ দরে এখন গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্যও পাওয়া যায় না।

এক সাইডে রাখুন ছবি দুটো। ঠাণ্ডা খাবেন? বলতে বলতে তিলক ডেকে ওঠে—প্রফুল্ল! প্রফুল্ল।

এঁজ্ঞে, যাই দাদাবাবু।

বাড়ি যাওয়ার আগে পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেছে প্রফুল্ল। ক্রিজ ভাঙা ব্যাগি ফুল প্যাণ্ট। তার ওপর ব্যাগি গেঞ্জি।

পরশুর বেশি দেরি করলে আমি কিন্তু তোমার পে থেকে কাটব। এখানে প্যায়রেলাল একা সব পারবে না। আমার ঘর-অফিসঘর ঝাঁট দেয়া, ডগি, গোল্ডি, রকিকে খাওয়ানো। বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। আমার রান্না। সে এ দুদিন নয় আমি হোটেল থেকে দই-ভাত আনিয়ে খেলাম।

ইদানীং বাইবের স্পাইসি খাবার একেবারেই সহ্য করতে পারি না। প্যায়রেলালের রান্না মুখে দেয়া যায় না। এমন ভাবনার ভেতর তিলক নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল।

প্রফুল্ল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

পরশু আসবি কিন্তু। না হলে বিপদ হয়ে যাবে। বলতে বলতে তিলক নতুন সিগারেটে যায়।—আর শোন, গোপাল-বাবুকে মহা-ডাবল দে. গ্লাসে। স্ট্র দেয়ার দরকার নেই।

গোপালবাবু, বিয়ার খাবেন? তিলক গোপালকে জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করায়।

প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে আছে। গোপালের মুখে যে হাসির ফুলটি ফুটে ওঠে,তার রঙ পড়ে নিতে অসুবিধে হয় না তিলকের।—মহা-

ডাবল ছাড়। বিয়ার দে। আমাকেও দে। দুটো। মাগ্ দিবি। আর সল্টেড কাজু। আপেলের টুকরো।

প্রফুল্ল তার হাতঘড়িতে ধর্মতলা থেকে বাস ছাড়ার সময় দেখছিল। দাদাবাবুর এখানে দাঁড়ালেই কাজের পর কাজ। সে তো বাবুরও ছিল, তবে অন্যরকম। ভাবতে ভাবতে প্রফুল্ল পুরনো ফ্রিজের পেটের ভেতর থেকে দু বোতল বিয়ার এনে মেহগনির টেবিলে রাখল। সঙ্গে কাচের দুটো বড় মগ। সল্টেড কাজুভর্তি ডিশ। জার্মান সিলভারের ট্রে-তে আপেলের টুকরো।

মগে বিয়ার ঢাললে অনেকটা ফেনা উপচে আসে। তার ভেতর টিউব ল্যাম্পের আলো ডুবে যাচ্ছিল। বুজবুজে ফেনা কেটে গেলে চিলড বিয়ারে ঠোঁট ঠেকাবে তিলক। ঢালার আগে কেমন করে যেন গ্লিসারিনটিকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে, বোতলটিকে বিশেষ কায়দায় ঝেঁকে। তিলক এ কায়দাটুকু জানে। বিয়ারের গ্লিসারিন পেটের পক্ষে ভালো না।

চিয়ার্স।

চিয়ার্স।

তেতোটুকু গলায় নামাবার আগে তারা দুজনেই ফর্মাল হয়ে চেয়েছিল।

ঠিক তখনই ফোন বেজে ওঠে। একবার দুবার তিনবার। তিলক ছুটে গিয়ে তার কর্ডলেস রিসিভার তুলে ধরলেই ওপার থেকে মিনার চেনা গলা ভেসে আসে—হাই, ইয়ার।

দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককল করছে মীনা। প্রাচীন মেহগনির কালো টেবিলের তিনটে পায়াতেই সিংহের থাবার ডিজাইন। টপটা শ্বেত পাথরের। তার ওপর লাল প্রিয়দর্শিনী। হাঁটু ঝুল বারমুডা পরা তিলক ফোন ধরে যেন বা একটু কেঁপে উঠল। তার পায়ের নীচে কার্পেটের আরাম। তাড়াতাড়িতে ঘরে পরার জুতোটাও পরে আসতে পারে নি।

হাই মীনা—তিলক গলায় বহু দিনের অদর্শন, উচ্ছ্বাস, বুভুক্ষা ফুটিয়ে তুলতে চাইল।

মীনা চতুর্বেদী—দিল্লি গেলে আমার সব চাইতে কাছের নারী। তিলকের হাতের ভেতর কর্ডলেস রিসিভার একটু একটু করে ঘেমে উঠছিল।

আরে ইয়ার. তেরে লিয়ে ম্যায়নে সোচা থা। সোচ রহা থা বহুত দিনোঁ সে, লাইন মিল নহি রহে হ্যায় না।

মীনার এই সব কথা শুনতে শুনতে তিলকের মনে হচ্ছিল মীনা অন্ধকারে হেসে উঠলে তার শাদা দাঁত দেখা যায়। এত সুন্দর সাজানো দাঁত। ইদানীং অবশ্য সিগারেট খেয়ে খেয়ে দাঁতে সামান্য স্পট।

কথা বলতে গিয়ে মীনা সামান্য কাশল।

ওর হাতে কি এখন ওর ফেভারিট ব্র্যাণ্ডের ধোঁয়া ওড়ানো সিগারেট—তিলক ভাবতে চাইছিল।

কব আ রহা তু দিল্লি—

আ যাউঙ্গা ভাই। কই ডাল বোটিকা ধান্দে পে

মীনা একটু চুপ—তারপর আবার বলল, ডকি, গোল্ডি, রকি—সব ঠিক হ্যায় না?

সব ঠিক হ্যায়। বিলকুল সহি— তু—

চলতা হ্যায় ইয়ার। পতা নেই— না জানে মন কিঁউ নেই লগতা—কই দিন সে তেরে ইয়াদেঁ—তনহাই—তনহাই—

বাস। বাস কর। রহান দে। সাগর নহি হ্যায় কা?

হ্যায় তো। লেকিন ওতো আপনা মনমৌজি—

কই জ্যাদা তো পি নহি রহে হ্যায়?

নহি। ফিরভি—তেরেকো ইয়াদ আ রহা হ্যায়। সিরফ তেরেকো। প্রমিস ইয়ার। বাই গাড কসম। ভগবানকি কসম। তেরেকো বহুত চাহতা হুঁ ম্যায়।

ধ্যাত পাগলি—ও তসবির কা কাপি ব্যাগেয়রা কর রহি হ্যায়?

কর তো রহি হ্যায়। লেকিন মন নেহি মানতা—তু কব আ রহা হ্যায় তিলক?

আউঙ্গা।

কব?

তিলক আর মীনার এই দূরাভাষ-সংলাপ শিডিউল সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। লাইন কাটার সময় হয়ে এলো। এস টি ডি কল-এর নির্দিষ্ট সময় থাকে। তাই তিলককেই 'বায়' বলতে হয়।

মীনাও 'বায়' বলে। লাইন কাটা পড়ে।

তিন

শ্যামপুকুর স্ট্রিটে। এ-বাড়িতে এখন অনেক শরিক। একতলায় বাঁধানো উঠোনে বেলেপাথর। তার চারপাশে শ্বেতপাথরের বর্ডার। এই শাদা পাথরের লাইন ঘিরে থামওয়ালা বারান্দা। ঢাকা। উঠোনের মাঝখানে গান, তরজা, পুজো—যাই হোক না কেন, বাড়ির মেয়েরা যাতে দেখতে পায় তার জন্যে দোতলায় লোহার ঢালাইয়ের নকশা। তার ওপর বুকে ভরা দিয়ে দাঁড়ানো যায়।

এই একতলায় বুলু বসাকের অফিসঘর। বুলু ছবি রিটাচ করে। পুরনো অয়েল পেইনটিং রং দিয়ে টাচ করে রিপেয়ার মতো। একতলায় অফিসঘরে বসে বসে বুলু ঘামছিল। পঞ্চাশ ছুঁয়েছে বয়েস। মাথায় থাক থাক শাদা চুল। বড় নয়। গালে ভারি মাংসের থাক। চোখে রোল্ড গোল্ড ফ্রেমের গোল চশমা। খুব ফাইন আদ্দির হাফ পাঞ্জাবি। মিলের সরু পাড় ধোয়া ধুতি। ইসকিমিক হার্ট বুলুর সিগারেট খাওয়া বারণ। বুলু সেই নিষেধ মানে না।

বুলুর হাতে কিং সাইজ পুড়ছিল। ঘরে ফ্যান বন্ধ। লোডশেডিং। হাতপাখায় মাঝে-মাঝেই ঘরের বাতাস সচল রাখতে

চাইছিল বুলু। তার কপালে, নাকের ডগায়, কানের লতিতে ঘামের দানা। চওড়া কাঁধ, পুরুষ্টু গর্দান। বুলুর ডান হাতের অনামিকায় হলুদ পোখরাজ। কনিষ্ঠায় ছ রতির পান্না। মধ্যমায় এমিথিস্ট। নীলার বিকল্প। গুরুমহারাজ বলেছেন। গলায় রুপো বাঁধানো পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, রুপোর চেনে। সঙ্গে গুরু-মহারাজের গুরু—পরমগুরুর ছবির লকেট।

ছ-পুরুষের এই বসাক-আলয়-এর রমরমা নুনের দেওয়ানীতে। তারপর তিন পুরুষ আগে স্টিভেডারি, পাটের দালালি।

বাড়ির উঁচু পাঁচিলে একটা কাক ডাকছিল। থামঅলা বারান্দা দিয়ে বড়জ্যাঠামশাই হেঁটে গেলেন, বুলু দেখতে পেল। আটহাতি ধুতি। গায়ে বুককাটা বোতাম বসানো ফতুয়া। শাদা রঙের। এ-ঘর থেকে বারান্দার দেয়ালে সিঁড়িতে ওঠার মুখে মুখে, প্রতিটি বাঁকে অজানা সাহেব চিত্রকরের আঁকা আলগাবসনা সুন্দরীরা। তাদের স্বচ্ছ, শিথিল বেশবাসের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সবুজ বনভূমি, জ্যোৎস্না। কখনও বা দ্রাক্ষাকুঞ্জ।

উঠোনে বড় দাঁড়ে প্রায় আশি ছোঁয়া কাকাতুয়া। বড়জ্যাঠা-মশাইয়েরই বয়সী। তার পালকের শাদাটুকু অনেকটাই শহুরে ধুলোয় অফ হোয়াইট। দুটো চন্দনা আছে বড় খাঁচায়। দুটো মদনা। হলুদ কানঅলা বড় পাহাড়ি ময়না গোটাদুই, বাঁশের খাঁচায়। তাদের জন্যে মাংসের কিমা আসে বাজার থেকে ঠাকুর-মশাই পুজো শেষ করে গেলেই, গৃহদেবতা মদনমোহন, সঙ্গে রাধারানী—আমরা বৈষ্ণব, বছরে পাঁচ বার উৎসব—দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, স্নানযাত্রা। এমন ভাবতে ভাবতে বুলু দেয়ালে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকে সময় দেখল। ঠিক এগারোটায় দিল্লি থেকে জৈনের আসার কথা। এখনও দশ মিনিট বাকি আছে।

বছর চল্লিশ আগেও এ-বাড়িতে মাংস-ডিম ঢোকানো ছিল রীতিমতো দুঃসাহসের ব্যাপার। মুরগির ডিম, মুরগির মাংস, পেঁয়াজ—অনেকটা স্বপ্নের বাইরে। কাউকে খাওয়াতে হলে

বাইরের বাড়িতে ব্যবস্থা ছিল। তার জন্যে আলাদা উনোন। আলাদা বাসন-পত্র। এখন সবটাই বদলে গেছে, ঠাকুমার মৃত্যুর পর সবাই আলাদা আলাদা। যে যার নিজের রান্নাঘরে কী করছে, কী খাচ্ছে—হেঁশেলের খবর কে আর নেয় ?

তিনতলা বাড়ির যেটুকু ছায়া, তারই ওপর পেতলের দাঁড়ে পালক ফোলানো কাকাতুয়াটি। পায়ে শিকল। দাঁড়ের দুপাশে দুটি বাটি। কলাবতী ফুল ডিজাইনের ঝুঁটিটি ঘাড়ের ওপর শোয়ানো। হলুদ রঙের।

বুলু জানে বড়জ্যাঠামশাই তুষার বসাক তাঁর সমানবয়েসী কাকাতুয়াটির সামনে মদনমোহনের প্রসাদী কলা, আমের টুকরোটি ধরে দাঁড়িয়ে অল্প দূরে সরে গিয়ে নাচানাচি করলেই একটু লাফালে আর 'কাইজার, কাইজার' বলে ডেকে উঠলেই, সেই দাঁড়ের পাখি কর্কশকণ্ঠে চার অক্ষরের একটি পরিষ্কার গালাগালি উচ্চারণে তার উষ্মাটুকু জানাবে, তারপর আরও স্পষ্ট স্বরে—অ্যাই তুষার, অ্যাই—বলে আবারও দু অক্ষরের একটি নতুন খারাপ কথা। ততক্ষণে তার মাথায় হলুদ ঝুঁটিটি পরিষ্কার ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। কী বাহার! কী বাহার!

বড়জ্যাঠামশাই পারেনও। সন্ধের পর আফিঙের একটা দুটো ছোট গুলি। তারপর কড়া মিষ্টি দিয়ে এক পো ঘন দুধ, সে-ও খাটাল থেকে আনানো। হরিণঘাটা, মাদার ডেয়ারি তিনি মুখে তোলেন না। কোনো কোনো দিন দুধ ফোটানো হয় গুড়ের বাতাসা, নয়তো মিছরি দিয়ে। তাতে এক-আধটা কিশমিশ, নয়তো মনক্কা।

সন্ধের পর এই আফিঙটুকু না হলে বড়জ্যাঠামশাইয়ের ঘুম আসে না। অনেক রাত অব্দি জেগে তাস খেলেন। নয়ত দাবা। ওঠেন একটু বেলা করে। নিজের খাস চাকরটিকে নিয়ে বাজারে যান। মোহনবাগানের খেলা থাকলে সকাল থেকেই টেনশনে প্রায় কারোর সঙ্গেই কথা বলেন না। আগে—এই আট-ন বছর আগেও

মাঠে যেতেন। একবার কলঘরে পড়ে গেলেন। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান শচীন ডাক্তার বলল, আপনি ব্যাচেলার মানুষ, অকারণে কেন একসাইটেড হচ্ছেন? তার থেকে ঘরে বরং একটা ছোট টিভি সেট—অনেক শান্তিতে।

কালার টেলিভিশন তারপরই বড়জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে। সঙ্গে রিমোট কনট্রোল।

রোদ্দুর একটু বেঁকে গেছে। কিন্তু তাপ অসহনীয়। এখনও আলো এল না। এসি-ডিসি—দুটোই গেছে। এখানে এসি কম যায়। তাই দুটো লাইন—সেই বাবা বেঁচে থাকতেই সব ভাইয়েরা মিলে বসে ঠিক করল, খরচের হিসেব। বুলুর মনে পড়ল বাবা মারা গেছে, তাও তো ন'বছর হয়ে গেল। সাতষট্টি—পরিষ্কার পেটানো চেহারা। বড়জ্যাঠামশাইয়ের মতো লম্বা নয়, একটু চৌকোমতো। নিয়মিত গঙ্গাস্নান। আহিরীটোলা ঘাটে শীতের সকালে সর্ষের তেলে মাসাজ করান। রাস্তা পেরতে গিয়ে, ভোরের ত্রিতলিকার নিচে। শুধু মাথার পেছনে একটা ছোট চোট। সেও তো পুজোর আগে আগে। পাশে গড়িয়ে যাওয়া কাঁসার ঘটিটি মাজা, পরিচ্ছন্ন। ঘাট থেকে স্নান সেরে কপালে রোজকারমতো চন্দন-চর্চা করেই ফিরছিলেন! রোজ ভোরে দাড়ি কামানো অভ্যেস ছিল, গঙ্গাস্নানে যাওয়ার আগে।

খালি গা। খালি পা। ঘটিটি গড়িয়ে একটু দূরে। তার জলরেখা ভোরের পিচ-বাঁধানো রাস্তায়। নিংড়ে রাখা গামছা, গঙ্গাস্নানের ধুতিটি—নিয়মিত গঙ্গাজলে তার রং অনেকটাই গেরুয়া পেয়েছে, সবই রাস্তার ওপর—যেন সাজানোই। বাবাও এক কাত হয়ে। একটু বোধহয় রক্ত পড়েছিল রাস্তার ওপর।

অল্প দূরে কোনো অবাঙালি পুণ্যার্থী গঙ্গা নেয়ে ফেরার পর কুকুর আর কাকেদের জন্যে রুটির টুকরো ছড়াচ্ছিল। গোলা পায়রাদের জন্যে ভিজে ছোলা। কোনো এক গাড়ির সচকিত হর্নে, হয়ত বা পুলিশের গাড়িই হবে পায়রার ঝাঁক উড়ে গেল

আকাশে। হাওয়ায় তাদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। বাবা এক কাত হয়ে রাস্তায় ওপর। সেখানে পেঁছে বলুর কেঁদে উঠতে সময় লেগেছিল বিস্ময়ের পর্দাটুকু সরিয়ে। ডানামেলা পায়রার ঝাঁক নেমে এসেছিল আবারও, খাবারের ওপরে।

বড়জ্যাঠামশাই কাইজারের দাঁড়ের সামনে এক হাতে পাথর-বাটিতে ঠাকুরের প্রসাদী কলা আর আমের টুকরো নিয়ে বাঁ হাত মাথার ওপর তুলে নাচছিলেন। আর কাইজারকে দেখিয়ে দেখিয়ে কলা, আমের টুকরো মাঝে মাঝেই মুখে দিচ্ছিলেন। কালো পাথরের বাটিতে রোদ পড়ে পিছলে যাচ্ছিল। 'কাইজার, কাইজার' —তুষার বসাক তার সমবয়েসী পাখিটিকে ডাকছিলেন। গায়ের পালক ফুলিয়ে শেকল বাঁধা পায়ে দাঁড়ের এপার থেকে ওপারে পায়চারি করছিল সেই প্রায় আশি বছরের কাকাতুয়া আর চার অক্ষরের খারাপ কথাটি একবার দুবার তিনবার বলার পর অ্যাই তুষার, অ্যাই তুষার, অ্যাই তুষার বলে ডাকছিল।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর এ-বাড়িতে বড়জ্যাঠামশাইকে নাম ধরার একজনই রয়ে গেছে। জ্যাঠামশাই কিন্তু নাচ থামাননি। বলু জানে যতক্ষণ না কাইজার তার ফুল হয়ে ওঠা ঝুঁটিটি মেলে ধরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ নাচানাচি থামবে না। গরমে ঘাম হচ্ছে, তবুও।

কাইজার দু অক্ষরের গালাগালিটি পর পর বেশ কয়েকবার বলে ডানা খুলল, ঝুঁটি ফোলাল। এর পর তার বাটিতে আম পড়বে, আঁটি ছাড়ানো জাম, কলা। ল্যাংড়া ষোলো টাকা, আঠারো টাকা কিলো। মজফ্ফরপুরের লিচু আঠারো, কুড়ি টাকা। চৌসা, দশেরি, বেনারসের ভালো ল্যাংড়া এখনও বাজারে আসেনি। ভাবতে ভাবতে বলু মিত্র নতুন সিগারেটে গেল।

মাথার পেছনে উঁচু কুলুঙ্গিতে রাখা লক্ষ্মী-গণেশের পাশে বড় গ্র্যান্ড ফাদারে এগারোটি ঘণ্টা পর পর বাজল। আর তখনই

বেজে উঠল প্রিয়দর্শিনী।

হ্যালো, কে বালুবাবু?

টেলিফোনের ওপার থেকে জৈনের গলা ভেসে এল।

বলছি।

বালুবাবু, আমি আজ এগারোটায় পঁওছতে পারলাম না।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি—বলতে বলতে বুলু বসাকের গলা বিনয়ে ভেঙে এল।

আমি আজ বিকেলে পঁওছব। ঠিক পাঁচটায়। আপনি সামানটা রেডি রাখবেন।

চৌকির ওপর গদি বেছানো। তার ওপর পাটি পাতা। দেয়ালের অনেকটাই মোড়া পাটি দিয়ে, মাথা হেলান দেয়া যায়, এমনটি উচ্চতা পর্যন্ত। একপাশে জলচৌকি। তার ওপর প্রিয়দর্শিনী টেলিফোন। দেয়ালে ছবি বলতে ডয়েলির আঁকা সেই কলকাতার প্রিন্ট, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে কেনা। মাটির সরায় আঁকা ফোক ফর্মের গণেশ। গোলাপি, হলুদ, সবুজ রং।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। রেডি থাকবে। আপনার বাবা ভালো আছেন? বলতে বলতে জলচৌকির ওপর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কোম্পানি থেকে দেয়া কাগজচাপা, একবার হাতে ছুঁলো বুলু। সেও তো কত বছর কেটে গেল, বাবার সেরেস্তা-ঘরে ছিল। যেমন জলচৌকির একপাশে রাখা পেতলের দুটো পেপারওয়েট, একটা হাত দিয়ে বাজানোর—আঙুল ঠুকে ঠুকে শব্দ তোলার কলিং বেল। একটা কলমদানি, দুটো বিলিতি কাট গ্লাসের দোয়াত, ছোট। এরও খরিদ্দার আসে প্রায় রোজই। তার ওপর ধুলো আছে, হয়ত সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল।

পিতাজি ভালো আছেন। হাঁ। হাঁ। কলকাতায় এলে আপনার সঙ্গে—হাঁ ভেট করবেন।

বুলু বসাক পেতলের চৌকো খাপের ভেতর সীসের টুকরো ঢোকানো কাগজচাপাটি বাঁ হাতের ভেতর টেনে নিল। শাদা

সুতো দিয়ে বাঁধা এই ভারি কাগজচাপাটি, তার গায়ে এমবস করা শিবদুর্গা, তাকে ঘিরে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন—এই বারোটি রাশিচক্রের ছবি। গুপ্তপ্রেসঅলাদের গিফট—সেও তো হয়ে গেল অনেক দিন।

পেতলের ওপর যে রুপোলি রংটুকু তা বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ছোঁয়ায় মুছে গিয়েছে। বুলু সেই চৌকো ওজনটুকু হাতে নিল। কাচের গোল পেপারওয়েট মাঝে মাঝে ঘোরান তার পুরনো অভ্যাস। চৌকো—অনেকটা বিড়ির কৌটো চেহারার এই চাপাটি ঘোরান যায় না। ওটা হাতে নিয়ে দুবার আলতো করে লোপালুপির পর, প্রিয়দর্শিনীর রিসিভারে নিজের গলাটি বসিয়ে দিতে পারে।—আমি সিওর থাকছি। ঠিক বিকেল পাঁচটায়।

তখনই এ ঘরের সিলিংয়ে ঘটাং শব্দে পুরনো ক্যালকাটা ফ্যানটি জেগে ওঠে। বাতাস। বাতাস। শীতলতা। বুলুর ঘামে-ভেজা শরীর আরাম পেয়ে যায়। লাল প্রিয়দর্শিনী নামিয়ে রেখে 'আঃ' বলে একটি মৃদু স্বস্তির শব্দ করে বুলু।

এ-বাঁড়ির ছায়াটি অনেকটাই নেমে এসেছে উঠোনে। সেখানে ঝিমোনো কাইজার। বুলু জলচৌকির ওপর শাদা জলরঙ প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেটটির দিকে একবার তাকাল। তারপর হাতে তুলে নিয়ে দরজায় শেকল তুলে, কড়ায় তালা দিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

ঠিক পাঁচটায় শ্যামপুকুর রোডের বসাক আলয়-এর সামনে লাল মারুতি এসে দাঁড়াল। শাদা ব্যাগি প্যান্ট, পায়ে কালো জ্যাকসন শু, শাদা মোজা, গুঁজেপরা পুরো-হাতা ঢোলা ফুলশার্ট। জৈনের বয়েস আঠাশ-ঊনত্রিশ। জৈন এ-বাড়িতে

নতুন নয়।

আসুন, আসুন। বসুন।

বড় চৌকির পাশে গোটাতিনেক চেয়ার আছে। নিজেকে চেয়ারে ছেড়ে দিতে দিতে জৈন বলল, মাল দেখান। তাড়া আছে।

চা খাবেন?

নাহ্।

ঠাণ্ডা কিছু! লস্যি! কোল্ড ড্রিংকস্! আমপোড়া শরবত। লেবু পাতা দিয়ে কাঁচা তেঁতুলের খাটাই?

কিছু না। জল—এক গিলাস পানি স্রিফ।

আঙুলে ঘণ্টার মাথাটি ঠুকে দিল বুলু। বাজাল। কাজের লোক পটাই হাজির এক মিনিটের মধ্যে।

বাবুকে ঠাণ্ডা জল দে।

মিশিয়ে দেয় যেন।

মিশিয়ে দিবি।

পটাই চলে যায়। দু মিনিটের ভেতর তার ফিরে আসা। হাতে চিনেমাটির শাদা ডিশে কাচের গ্লাসে জল। ভেতরের ঠাণ্ডাটুকু তার গা-টি ঘামিয়ে দিতে পারে। গ্লাসের মাথায় প্লাস্টিকের ঢাকনা।

জল খেতে খুব কম সময় লাগে জৈনের। জলের গুঁড়ো জড়িয়ে যায় তাঁর মোটা গোঁফে। গ্লাস পাটি-মোড়া চৌকির ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে জৈন বলল, কই! মাল দেখান।

জল রঙের স্বচ্ছ, প্লাস্টিক-মোড়া প্যাকেটটি জলচৌকির ওপরে ছিল। সেটি ধীরে তুলে নিল বুলু। তারপর সেটি আস্তে খুলে ফেলতে ফেলতে একবার তাকিয়ে নিল জৈনের মুখের দিকে। জৈন চোখ বড় বড় করে সে দিকে তাকিয়ে।

শাদা প্লাস্টিক মোড়কের ভেতর ইংরেজি কাগজে মোড়া দশটি ছবি। পাহাড়ি চিত্রকলা। বুলু শক্ত বোর্ডের ভেতর মাউন্টিং করা ছবিগুলো উল্টে যাচ্ছিল। কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, নৌকা-

বিলাস, রাসলীলা—হলুদ, সবুজ, খয়েরি, কোথাও কোথাও রং তুলে নিয়ে গেছে সময়ের দাঁত।

ছবি—পাহাড়ি চিত্রকলা দেখাতে দেখাতে বুলু আড়ে আড়ে জৈনের চোখ, মুখ পড়ে নিতে পারে। দখল, আঁকড়ে ধরার চেনা আলো সেখানে ফুটে ওঠে কিনা—সেটুকু বুঝে ওঠার আগেই জৈন বলল, আর কী আছে দেখান।

পাহাড়ি পছন্দ হলো না?

বোর্ডে মাউণ্ট-করা ছবিগুলো একটু তাড়াতাড়ি শাফ্‌ল করে নিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখল জৈন।—কত দাম বলছেন? প্রাইস?

একদাম বলব আপনাকে। আপনি পুরনো ক্লায়েণ্ট—দশটা ছবি পঁচাত্তর হাজার।

জৈন বুকপকেট থেকে পানপরাগের পাউচ বের করে দাঁতে ছিঁড়ে জিভে ঢালল। নীল রঙের ওপর সোনালি-হলুদ অক্ষরমালা। খাবেন? বলতে বলতে জৈন পানপরাগের প্যাকেটটি এগিয়ে দিল বুলু বসাকের দিকে।

নাহ্, আমি পানপরাগ—

কি, কেনসারের ভয় করছেন? হাঁ-মুখে পানপরাগ ঢালা অবস্থাতেই জৈন হাসছে।

না মানে—আচ্ছা দিন। হাত পেতে পাউচের থেকে গুঁড়ো দানা নিল বুলু। মুখে দিল।

আমার শৈলজ্ মুখুর্জি কী হল? জার্মান প্রিন্টস? অবনী ঠাকুর?

হবে। হবে।

সে তো কবে থেকেই বলছেন।

দুখানা রামকিংকর আছে, দেখবেন?

কি, বড় কাজ? অয়েল? জৈন নড়ে বসল।

পেনসিল স্কেচ।

দেখান।

এ-ঘরের এক কোণে একটা কাঠের বড় আলমারি আছে। তার পাশে বেঁটে আয়রন চেস্ট। চেস্টের গায়ে ঢালাই লোহার একটা ডিজাইন—ফুলের। তার হাতলটি লোহার, যেনবা কোনো মুঠো-করা হাত। দুবার ঘোরালে ঘট, ঘটাং ঘটাং শব্দ ওঠে। তার ভেতর ওষুধের বোতলের চারপাশে, বাক্সের ভেতর, ঢেউ-খেলানো পিসবোর্ডের যেমন বেড়া থাকে, সে রকম একটা ভাঁজ-করা মোড়কের ভেতর আলগা আলগা দুটি স্কেচ। এক আদিবাসী নারী। স্তন, নিতম্বে স্বাস্থ্যের ঢেউ। আর একটিতে হয়ত সেই যক্ষটি, যাকে দিল্লিতে রামকিংকর বসিয়েছিলেন যক্ষীর পাশে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে—এটি তারই ড্রইং বুলু জৈনকে বোঝাতে চাইছিল।

একটা হালকা ব্রাউন রঙের খাম। তাতে ডাকঘরের ছাপ। তার ওপর কালো কালির যক্ষ। নীচে রামকিংকরের সই, ছবিতেই —বাংলায় 'রামকিংকর'।

স্কেচের ওপর জৈন ঝুঁকে পড়ল। তারপর ছবি তুলে, চোখের কাছে নিয়ে এসে, এই সিয়াহিটা দেখুন—বলে রামকিংকরের সইয়ের কালির দিকে বুলুর চোখ টেনে আনল।

জেনুইন জিনিস। সইয়ের কথা বলতে পারব না। তবে রামকিংকরের সই-ই হবে।

না আমি দস্তখতের সিয়াহিটা বলছিলাম, আপনি দেখেন।

আমি বলছি, জিনিস জেনুইন—

কত দিব?

আপনার জন্যে দুটো এক হাজার! এক দর।

আটশ দিব।

এ কী মাছের বাজার নাকি। থেকে এ সবে দরাদরি হয় না।

ঢিলে প্যান্টের পাশপকেট থেকে হলুদ রাবার ব্যান্ড বাঁধা নোটের বান্ডিল বের করে ফেলেছে জৈন। একশ টাকার

গাড়ি।

দশটি নোট গুনে ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, জৈন ততটুকুই মাথা নিচু করে রইল। টাকা হাতবদল হতে যা সময় লাগে, বুলু তারপর টাকা গুনতে সময় নিল—এই দুটি ক্ষণ-বিরতির পর বুলু জিগ্যেস করে, পাহাড়ি কি হলো?

পঁচাত্তর হাজার দিয়ে এই মাল! বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে চৌকির কোণ থেকে কাটগ্লাসের সেরেস্তা-দোয়াতটি টেনে নিয়ে জৈন বলল, এই সিয়াহির ডিব্বাটা যদি আপনাকে কেউ তিন হাজার টাকায় বেচতে চায়, আপনি নেবেন?

রোল্ডগোল্ডের চশমা আঙুলে ঠেলে, ওপরে তুলে দিয়ে বুলু একটু হাসল।—তাহলে চলল না?

আপনি লিখে নেন বালুবাবু। এ টেগোর, শৈলজ্ মুখুর্জি, জার্মান প্রিন্টস। এই ছোটমোটো ডিলিংয়ে কিছু হোবে? কলকাতার রাস্তায় ঘোরার টেকসি ভাড়া ভি হোবে না। নেহাত হামার জিগরি দোস্ত সামতানির মারুতি—পেট্রোল খরচা দিয়ে—নোটের বাণ্ডিল প্যান্টের পকেটে ঠিক জায়গায় আছে কি না, দেখে নিতে নিতে বুকপকেট থেকে পানপরাগের পাউচটি বের করে—কি লিবেন নাকি বুলুবাবু একটু—বলতে বলতে নিজের মুখে ঢেলে নিতে পারে জৈন।

বুলু বসাক দশটি পাহাড়ি চিত্রকলার বাণ্ডিলটি ইংরেজি খবরের কাগজে মুড়ে জল রং প্লাস্টিকে মুড়ে নিতে পেরেছিল।

আমি যাচ্ছি বালুবাবু।

দিল্লি ফিরে একবার এস টি ডি-তে—

জানাব। বলব। কিন্তু আপনি দেখবেন—শৈলজ্ মুখুর্জি, এ টেগোর, জার্মান প্রিন্টস্।

দেখব। নিশ্চয়ই দেখব। শুনুন, একটা খাট আছে—পালঙ্ক—আপনারা কি ফার্নিচার কেনেন?

কিনি। কিনি। সব কিনি। তবে দু-এক হাজার টাকার

ফার্নিচার নয়। দশ-বিশ-পঞ্চাশ—

ছয় বাই সাত পালঙ্ক—মেহগনির। মিরার ফিট্ করা। মশারি টাঙানোর ছত্রীতে ডিজাইন। চারপাশে চারটে পরী।

কত-তে দিচ্ছেন?

আপনার জন্যে, আপনি নেবেন বলে পঁচিশ হাজার।

আজ দেখাতে পারেন?

বুলু বসাক জৈনের চোখের দিকে তাকাল। হালকা খয়েরি মণিতে দখলের আলো খেলা করছে।

সোদপুরে আছে। আমার এক মেটারনাল কাজিনের বাড়ি। নিজে শোবে বলে কিনেছিল। এখন পয়সার অভাবে পার্টি খুঁজছে। আমায় বলছিল।

সোদপুর—এখন! তাহলে এবারে আর হলো না। সামনের বার।

জৈন উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে সেই ঢেউ খেলানো পাতলা পিস্ বোর্ডের ভাঁজে দুটি রামকিংকর বেইজের স্কেচ।

সামনের উঠোনে আলো ডুবে যাচ্ছিল অন্ধকারে। কাইজার ঝিমিয়ে রয়েছে দাঁড়ের ওপর। একতলায় থামঅলা, ঘোরানো বারান্দার দেয়ালে দেয়ালে কাচঘেরা আলোর শেড। সেখানে প্রাচীন এই শহরে মোম জ্বেলে দেয়ার নিয়ম ছিল। বাতি জ্বালানোর জন্যে তখন মাস মাইনের লোক। খাসগেলাস, ফানুস—ঝাড়ের, বাতির শেডের কত কি নাম! এখন সেই সব বাহারি কাচের ফানুস আর নেই। ফ্রেঞ্চ গ্লাস ছিল সব। এখন একটু পুরনো কাচের শেড আছে। তার ভেতর ইলেকট্রিক বালব।

লম্বা উঠোন পেরিয়ে জৈন চলে যাচ্ছিল।

বুলু বসাকের মনে পড়ল এমনই এক শেষ বিকেল তারা রামকিংকর বেইজের বাড়ি গিয়েছিল। তিনি তখন শঙ্খ চৌধুরীর বাড়ি থাকেন। অনেকটা উঁচু, ক্ষয়ে-যাওয়া মাটির দাওয়া। পাশে বোধহয় একটা থাম ছিল। রামকিংকর দাঁড়িয়ে ছিলেন। কনুই

অব্দি হাতাঅলা গেঞ্জি। লুঙ্গি। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। সেটা সাতাত্তর সাল কি? তারও আগে হবে হয়ত। শান্তিনিকেতনের বাতাসে দোল।

কে যেন বলেছিল, এক বোতল দেশি নিয়ে যাবেন বা সাঁওতাল-পাড়া থেকে মহুয়া। বুলুর বন্ধুরা সবাই তার থেকে দশ-বারো বছরের ছোট। আর্ট কলেজের ছাত্র, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার সব। রামকিংকর তখনই জীবন্ত মিথ। দিল্লির যক্ষ-যক্ষী হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গরমে আকাশ ফাটিয়ে রোদ উঠলেই টোকা মাথায় দিয়ে শান্তিনিকেতনের ফাঁকা মাঠের ভেতর ঢালাই করান, সিমেন্ট-কাঁকর মিশিয়ে মূর্তি। যা কিনা ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে অভিনব। অনেকটা মহুয়া খেয়ে গান গাইতে পারেন, গলা ছেড়ে—রবীন্দ্রনাথের গান—'আমি চিনি গো চিনি তোমারে—' ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোয়াইয়ে বসে থাকেন।

কিংকরদা থাকেন এদিকে—এমন জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে তারা শঙ্খ চৌধুরীর বাড়ির উঠোনে পেঁছে যেতে পারে। তখন সকাল আটটা। কাল দোল। তারা মহুয়া নেয়নি। কালোর দোকানের ল্যাংচা নিয়ে গেছিল ভাঁড়ে বেঁধে। উনি হাত বাড়িয়ে নিলেন। রামকিংকর দাঁড়িয়েছিলেন শঙ্খ চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায়। উঁচু বারান্দা। সামনে গোটা দুই ভাঙা, আস্ত থাম। এখন মনে পড়ছে থাম ছিল। তারপর তাঁর বেইজ পদবী। কংগ্রেসের পোস্টার লিখে শান্তিনিকেতনে পালিয়ে আসা। রবীন্দ্রনাথ, নন্দবাবুর নজরে পড়া, নন্দলালের সঙ্গে ছবি নিয়ে মতে না মেলা, বিনোদবিহারীর বন্ধুত্ব—এসব কথা।

সকালে সব কথা শেষ হয়নি। তারা সেই বিকেলে আবারও গেছিল। তিনি সস্তার চেয়ারে বসেছিলেন। পাশের খেলো টেবিলে ফুলদানিতে টাটকা বোগেনভেলিয়া। ঘন ঘন প্লাজা সিগারেট টানছিলেন রামকিংকর। বেশ খেয়ে আছেন। গন্ধ আসছিল।

উঠোনে তখনও ধান। ধানের পাশে শিশু। তার পাশে বাচ্চাসহ বেড়াল। রামকিংকরের কোলে মা-বেড়ালটি উঠে এল। তিনি বললেন, এর নাম পুষি, বাচ্চার নাম হাসি আর খুশি।

হলুদ ধান ঢাকা ছিল তাঁর তেলরঙে আঁকা ক্যানভাসে। উঠোনে শেষ-না-হওয়া সিমেন্ট ঢালাইয়ের কাজ। তখনও রড বাঁধা। তাঁর বড় অয়েল পেইনটিংয়ে এভাবে ধান ঢাকা আছে দেখে তারা কষ্ট পেয়েছিল। এই জিজ্ঞাসা রামকিংকরের কাছে নিয়ে গেলে তিনি হেসেছিলেন। তাঁর রান্না করে দিতেন লালদি নামে এক বিধবা মহিলা।

অনেক ছবি এভাবে মাচার ওপর। ধুলো, মাকড়সার জাল।

বুলু বসাক, তার বন্ধুরা অনেক সাহস করে তাঁকে একটা স্কেচ এঁকে দিতে বলেছিল। তিনি সূর্যমুখী আঁকলেন। ফুটন্ত সূর্যমুখী। নিচে সই বাংলায়—রামকিংকর, তারিখ। সকলের টুকরো কাগজ, ডায়েরি, খাতাতেই সূর্যমুখী। পছন্দ না হলে ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে মেঝেয় ফেলে দিচ্ছেন। মাটির দাওয়ায় দলা-পাকানো স্কেচের কাগজ হাওয়ায় ছুটোছুটি করছিল। দাওয়ার নিচে উঠোনে ন্যাংটো শিশু, ছাগল, বেড়াল, কুকুর। বেলা পড়ে আসছিল। বোগেনভেলিয়ার ফুলে বেলা শেষের রোদ। রোদ্দুর কিংকরদার চশমার কাচে। মাথার ঘন, কাঁচা-পাকা চুলে।

আঁকতে, আঁকতে বলতে বলতে লেডিজ হস্টেলের সামনে সেই তৃষ্ণার্ত মোষের কথা উঠতেই রামকিংকর বললেন, ঋত্বিক সেই যে সেবার এল। খুব আলো, ক্যামেরা, শ্যুটিং। জিভ বের করা মোষের সামনে কত ছবি তুলল। আমায় কী বকাবকি। আর খালি খাচ্ছে। মহুয়া খাচ্ছে। বিড়ি। আমিও খাচ্ছি। গান গাইছি। গুরুদেবের গান। হাসছি। বলতে বলতে দূরমনস্ক স্মৃতি থামিয়ে চশমার কাচে বিদায়বেলার রোদ লাগিয়ে রামকিংকর বলতে পারলেন—ঋত্বিক তো আবার আসবে। ও যে বলে গেল।

তারপরই ঘাড় এক পাশে কাত করে দূরে, আলো মুছে যাওয়া

আকাশ একবার দেখে নিয়ে—ও তো আর আসবে না। ঋত্বিক তো মরে গেছে—বলতে বলতে চশমাটি হাতে খুলে নিয়ে একেবারেই চুপ হয়ে যান।

বুলুর মনে আছে বিকেলে রামকিংকর লুঙ্গির ওপর সুতির শার্ট পরেছিলেন। তারা বারবার জিগ্যেস করে 'সাঁওতাল পরিবার', 'কলের বাঁশি', বড়, তেলরঙে আঁকা ক্যানভাসে শুধুই গতি আর জীবন ফুটে ওঠে কি না জানতে চাইছিল—কৌতূহলেই। তিনি এড়াতে চাইছিলেন। কোলের বেড়াল বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে চাইছিলেন

তারা উঠে পড়েছিল। এ বছরই দোলে তারা প্রথম শান্তিনিকেতনে। আজ রাতে বৈতালিক। আশ্রম পরিক্রমা।—'নিবিড় অমা তিমির হতে বাহির হলো / জোয়ার স্রোতে চাঁদের তরণী—' বোধহয় কোনো গানের লাইন। গোটা খোয়াই, আশ্রম, তালবনের সারি চাঁদের আলোয় থইথই। পূর্বপল্লীর কোনো ফাঁকা মাঠে একটি খালি গোরুর গাড়ির ওপর তারা তিন জন—বুলু বসাক, রবি সান্যাল, সুকোমল চৌধুরী চুপ করে শুয়েছিল। চাঁদ ঢুকে যাচ্ছিল মাথার ভেতর। কিংবা কোনো নিয়তি হয়ে তাকিয়েছিল আকাশের গায়ে। হিম নামছিল ধীরে।

রবি পরে এই কম্পোজিশন নিয়ে অয়েলে মাঝারি কাজও করেছিল। রবি এখন মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানির পূর্বভারতের বড়কর্তা। মাঝে মাঝে ফোন করে। ছবি আঁকে না। ছবি কেনে। ভালো কিছুর খবর থাকলে বুলু দেয়।

পরদিন ভোরে গৌর প্রাঙ্গণে 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল', 'আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা'—এই সব গানের সঙ্গে তারাও আবির-সৌন্দর্য উৎসবে মিশেছিল।

এর পর আরও বছর দুই পর দেখা রামকিংকরের সঙ্গে। তারা জয়দেব-কেঁদুলির মেলা সেরে মাঘের প্রথমে শান্তিনিকেতন হয়ে কলকাতা যেতে চাইছিল। শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনের

সামনে অনসূয়া চট্টরাজ, এমন রূপসী নারী—তারা তো মুগ্ধই বেশ তখন, কলাভবনের সামনে তাদের 'বো-টু, বো-টু'—যার পুরো মানে 'বোকা ট্যুরিস্ট' বলে ডেকে—হঠাৎই গান গেয়ে ওঠে—'কলাভবনে এসেছে যারা/তাদের স্বাগত জানাই।'

কবি নীলাক্ষ সিংহ ছিল। আর ডাক্তার অশোক উপাধ্যায়। বোলপুর স্টেশনে নেমে তারা এক ছিলিম করে গাঁজা খেয়েছিল। তখনও মাথার ভেতর ছিলিমের নাচন। স্টেশনের বাইরে দোকানে মাছিবসা জিলিপি আর গজা। খুব কড়া মিষ্টি। হাওয়া লেগে নেশা একটু করে ফুল হয়ে ফুটে উঠছিল মাথার ভেতর।

তত দিনে কিংকরদার সঙ্গে দেখা করার আরও একটু তাগিদ হয়েছে। তিনি তখন শঙ্খ চৌধুরীর বাড়ি থাকেন না। আরও একটু দূরে একতলা বিশ্বভারতী কোয়াটার্সে। সবুজ ঘাসের ওপর অনসূয়া চট্টরাজের পাশে বসে আড্ডা দিতে দিতে সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। নীলাক্ষ বলল, একটা গান শুনব।

গান শোনাল অনসূয়া—'আমার সকল দুখের প্রদীপ।' তার ফর্সা মুখে কী এক বিষাদ খেলা করছিল। গানের ওঠানামা, তানকারির সঙ্গে সঙ্গে। যা কি না কিছু আগের অনসূয়ার সঙ্গে মিলছিল না।

অনসূয়ার আশেপাশে বসা গুণমুগ্ধদের মধ্যে থেকে কে যেন বলেছিল, কিংকরদার বাড়ি আপনাদের রিকশাঅলাই নিয়ে যাবে। ওরা সবাই চেনে।

তারা একটা রিকশায় বেশি ভাড়া দিয়ে সেই হলদে একতলার কাছে পৌঁছেছিল। শীতের দুটো আড়াইটে হবে। স্নান হয়নি। ভাত খাওয়াও না। সামনের বারান্দায় সিমেন্টের উঁচু রেলিংয়ে বসেছিল। পাশে কাঁধের ব্যাগ।

রামকিংকর ফিরলেন রিকশায়। চেককাটা হ্যান্ডলুমের ফুলশার্ট, হাত গুটিয়ে পরা। নীলচেমতো একটা ফুলপ্যান্ট। তার চেন খোলা। প্যান্ট ভিজে—সম্ভবত ছোট প্রাকৃতিক কর্মটি

হয়ে গেছে। কিংকরদার পায়ে হাওয়াই চপ্পল। তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। হাত ধরে ছিলেন রাধারানী। রামকিংকরের এক হাতে ফুলকপি, অন্য হাতে আস্ত রুইমাছ। বোধহয় ব্যাঙ্কে গেছিলেন পেনশন তুলতে, নয়তো টাকা।

নাক দিয়ে সর্দি গড়াচ্ছে। কাঁচাপাকা চুল এলোমেলো। বুলুকে দেখে তিনি চেনা মানুষের হাসি হাসলেন। এমনটি বোধহয় তাঁর অভ্যাসে। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়েছে।

কিংকরদা কেমন আছেন ?

ভালো। ভালো। খুব ভালো।

মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাধারানী ততক্ষণে দরজার তালা খুলে ফেলেছে।

আজ আপনারা যান গো। শরীরটা ভালো নাই। বলতে বলতে কিংকরদা দরজার ফ্রেমে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। রাধারানী এসে হাত ধরল। যক্ষ-যক্ষী করতে দিল্লি যাওয়ার পথে চুনার স্টেশনে পাথর দেখতে নেমে গিয়ে এই মহিলাকে একলা ট্রেনে ফেলে রেখে রামকিংকর কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছিলেন।

বুলু এ সব কোথায় যেন পড়েছিল। নাকি শুনেছিল কারুর কাছে!

আজ আসুন আপনারা। বলতে বলতে কিংকরদা ঘরে পেঁছে গেছিলেন।

তাঁর এঁকে দেওয়া সূর্যমুখী কীভাবে যেন হারিয়ে ফেলেছিল বুলু। আজ থাকলে সেটাও জৈনকে—। আসলে সেও তো পেইন্টার হতে চেয়েছিল—চিত্রকর বুলু বসাক। এগজিবিশন হবে, প্রথমে গ্রুপ, পরে সোলো। ছবি বিক্রি হবে। দেশে-বিদেশে। বড় শিল্পপতির ব্যক্তিগত সংগ্রহে, দেশ-বিদেশের গ্যালারিতে। তা হয় নি। বুলুকে এখন ছবি রিপেয়ার করতে হয়। পুরনো পেইনটিং-এ শেড মিলিয়ে জোড়া-তাপ্পি দেওয়া। যাতে বোঝা না যায়, তার জন্যে কালেকটারদের থেকে পেমেন্ট।

সব শেষে এই জিনিস দেখান—মাঝখানে নিজের কমিশন !

জৈনের লাল মারুতির জ্বলে যাওয়া জ্বালানি-গন্ধ এখনও এই পাড়ার বাতাসে। নিজের অফিস-ঘর, বেলেপাথর বাঁধানো উঠোন, তারপর সেই ঘোরানো বারান্দা—সেটি পেরিয়ে সরু প্যাসেজ। তার দুদিকে সিমেন্টের উঁচু ধাপ। দুজন মানুষ শুতে পারে, সেই সময়ে এখানেই এ-বাড়ির বন্দুকধারী দারোয়ান চৌবে আর মিশির। এত বড় একটা বাড়ি, এতটা জায়গা। বুলুর মাঝে-মাঝেই মনে হয় প্রমোটারকে দিয়ে দিলে তার কাছ থেকে মোটা টাকা ক্যাশ, তার কিছুটা ব্যাংকে, বাকিটা শাদা টাকায়। প্রত্যেকে দুটো করে ফ্ল্যাট পেত। একটা ভাড়া দাও, একটায় থাক। অন্তত বারোশ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। সারাজীবন আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হত না। হাফ-পাঞ্জাবির বুকপকেটে তখনও জৈনের টাকা। হাত দিয়ে টের পেল বুলু বসাক। কমিশনের ফাইভ পার্সেন্ট কেটে পার্টিকে পাঠাতে হবে। এই তো জীবন ! দালালি। দালালি। কমিশন। পার্সেন্টেজ।

ফিরে আসতে আসতে বুলু দেখতে পেল ছাদে কালো রঙের কাপড় উড়ছে। তার সঙ্গে দু আঙুল মুখে পুরে তীব্র সিটি। মেজ জ্যাঠামশাই পায়রা নামাচ্ছেন আকাশ থেকে। পাশে তাঁর বড়ছেলে। এ-বাড়ির মাথায় এখনও পায়রা নামার বড় বাঁশের 'বোম্' আছে। পাশে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আউটডোর টিভি অ্যানটেনা।

গেরোবাজ, শাদদুম, কালপেটিয়া, চিনি, সিরাজু, পরপন, চিলে-পরপন, হোমার। মেজ জ্যাঠামশাইয়ের হোমারও আছে। বাচ্চা তুলেছেন কয়েকদিন আগে। পায়রা পোষা, লুটে আনা, ব্রিড করান, বাচ্চা তোলা—এ সবে নিরন্তর গবেষণা।

চুয়াত্তরের মেজ জ্যাঠামশাই শিস দিচ্ছেন। অনাদি বসাকের পায়রা-ডাকা শিস বিখ্যাত এ অঞ্চলে। এখনই ওড়ন-ফেরত পায়রারা ছাদে নেমে জল খাবে। খোপে ঢোকার আগে প্রত্যেককে

দেখবেন অনাদি। দরকার মনে করলে হাতে নেবেন।

এমন ভাবনার মধ্যেই বুলু তার অফিস-ঘরের সামনে পেঁছে যেতে পেরেছে। মনে মনে আওড়াচ্ছিল জৈনের দেয়া অর্ডার—অবনী ঠাকুর, শৈলজ মুখার্জি, জার্মান প্রিণ্টস। কিনে যা কিনে যা, কালো টাকায় ছবি। তার তো কোনো হিসেব নেই। কে অ্যাসেস করবে, এক লক্ষ টাকার জিনিস তিরিশ হাজার টাকা হিসেবে শো করলে। সেই অর্থে অ্যাণ্টিকের তো কোনো দাম হয় না। ডিমাণ্ডের ওপব, পছন্দের ওপর দাম কমে বাড়ে। আর কে কোন জিনিসটা কালেক্ট করে, তাব খানিকটা জানা থাকলে ব্রোকার, সাপ্লায়াবের সুবিধে। আসলে জিনিস কম, বায়ার, সাপ্লায়ার অনেক, অনেক বেশি। তাই একই জিনিস, জেনুইন হলে ঘুরে-ফিরে এ-হাত ও-হাত। সবাই 'মাল' কিনতে চায়। বুলু বসাকের সামনে জৈনের মোটা গোঁফওয়ালা বয়সের তুলনায় ভারি, লালচে গোল মুখ, হালকা হালকা খয়েরি মণিতে ফুটে ওঠা দখলের আগুন ভেসে উঠেই মুছে গেল।

বসাক আলয়-এর রাতটি এ রকম। বুলু তার মায়ের সামনে বসে রাতের খাওয়া সারছে। এখনও শেষ পাতে একটু ক্ষীর খাওয়া অভ্যেস বুলুর। রাতে গরম লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল, দুটুকরো পাঁঠার মাংস। মাটন তো চৌষট্টি টাকা কিলো দাঁড়াল। ঐ আড়াইশ মতো আনলে দিনতিনেক। বড়-জ্যাঠামশাই রাতে আফিং, কিশমিশ দিয়ে ফোটানো ঘন দুধের পর শুকনো খই দিয়ে মাখা সন্দেশ খান।

মেজজ্যাঠামশাইয়ের জন্যে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে আসে সরের নাড়ু। রোজ রাতে চাই। একতলায় ছোটকাকা রাতে পরোটার সঙ্গে শুধু আলুভাজা, ঢ্যাঁড়শভাজা, কুচি কুচি করে কাটা নারকেলভাজা। ফুলকপিভাজা—যে সিজনে যেমন হয়ে থাকে।

থালার পাশে একটু আদা কুচি। কোনো একটা আচার, সামান্য। তিনতলায় কাকিমা, কাকামণি, তাদের দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়, বিয়ে হয়ে গেছে—একটি লোকাল মাস্তানের সঙ্গে। তা নিয়ে ঝামেলা বড় কম হয়নি। ছেলেটি ব্যবসা করছে—কেটারিং, বিয়ের তত্ত্ব সাজানো, বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন, অন্যান্য অনুষ্ঠানের ভিডিও-তে ছবি তুলে রাখা।

কচি পাঁঠার প্রায় ফাইবারশূন্য সুসিদ্ধ মাংস—প্রেসার কুকারে নয়, হাঁড়িতে—ডান হাতের মোটা মোটা বুড়ো আঙুলে লুচির ভেতর থেঁতলে বসিয়ে দিতে বুলুর মনে হলো তাদের বাল্যকালে এই মাংসই ছিল দেড় টাকা, দু টাকা। তখনও বাড়িতে মাংস ঢোকার রেওয়াজ হয়নি। মাংস ঠাকুরমশাই রান্না করেছে। মা একটু দূরে বসে ছোট কেরোসিন স্টোভে লুচি ভাজছিল। একখানা করে তুলে দেবে বুলুর পাতে। এমন রোজ হয়। ঠিক রাত নটা থেকে সাড়ে নটার ভেতর—বুলু বসাক ইণ্টারকম তুলে মা কমল-নয়নী বসাককে বলে দেবে আজ রাতে তার মেইন ফুড কী—পরোটা না লুচি। বেশিরভাগ দিনই পছন্দের তালিকায় ফুলকো লুচি থেকে যায়। ইণ্টারকমে না বলে কোনো কোনো দিন বুলু বেল বাজিয়ে তার কাজের খাস লোকটিকে ডাকে। পটাই এ সব ব্যাপারে খুব ওবিডিয়েণ্ট।

লুচি বেলতে বেলতে কমলনয়নী মনে করতে পারেন কলকাতার রাস্তায় গ্রামোফোন বিক্রি করা মানুষেরা বাড়ি বাড়ি এসে রেকর্ড, মেশিন দিয়ে যাচ্ছে। দু-তিন দিন রেখে, শুনে ফেরত দাও। নয়ত কিনে ফেল।

থিয়েটার দেখতে গেলে শো ফুরিয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক বাড়ির কাজের মহিলা যাদের 'ঝি' বলাই রেওয়াজ ছিল, হাঁক দিয়ে বলছে, অমুক বাড়ির ঝি—অমুক বাড়ির গিন্নির জন্যে অপেক্ষা করছে।

সেইসব রেকর্ডের গান, 'রেকর্ড সংগীত' নামের বই, চিত্তরঞ্জন

গোস্বামীর কমিক—'রাবণ আসিল যুদ্ধে পরিবুটজুতা···হনুমান করে দন্ত কিড়িমিড়ি'—কমলনয়নী লুচির পিঠ পালটে দিচ্ছিলেন। বেশি লাল হলে বুলু খেতে চায় না। কমিক করা মানুষটির মাথায় টাক ছিল। ভোলাভালা মুখ। কমলনয়নীর মনে পড়ল।

রাতে খাওয়ার পর ভাজামৌরী খেয়ে বুলু শোয়। বড় পালঙ্কে। মা নিচে। তাদের ভাগে আরও একটি ঘর, এখন তালা দেয়া। অরুন্ধতী এ-বাড়ি থেকে চলে গেল বীরভূমের এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। তারপর তো এমনই। সেভাবেতো ডির্ভোস হলো না। আমরা দু জন দু জায়গায় চলে গেলাম। কোনো শীতের বিকেলে রামপুরহাটের কাছাকাছি অরুন্ধতীর ভাড়া বাসায় গেলে দেখা যাবে অরুন্ধতী সামনে যেটুকু জমি—তার সবুজচর্চায়। চন্দ্রমল্লিকার হেসে ওঠা গাছে তার জলদান। হাতে জলের ঝারি। চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা। গড়ন, মুখের ধাঁচে অনেকটা যেন বাংলা সিনেমার কাবেরী বসু। দু হাতে সোনার বালা। সামনের চুলে, মাথায় এক-আধটা রুপোলি আঁচড়।

অরুন্ধতীর বসার ঘরে বুলুর আঁকা অরুন্ধতী বসাকের রঙিন পোর্ট্রেট, টেম্পেরা। সেখানে বীরভূমের কিছু লাল ধুলো। হালকা হালকা মাকড়সার জাল। বুলুর আর্টিস্টথেকে ধীরে ধীরে দালাল হয়ে ওঠা অরুন্ধতী মেনে নিতেপারেনি।—আমারতো কিছু করার ছিল না। এ দেশে ছবি বিক্রি করে দিন চালান যায় না। আজও একশ টাকা, মাত্র একশ টাকায় একটা ছবি কিনে ঘর সাজানোর মন তৈরি হলো না বাঙালি মধ্যবিত্তের। একশ টাকায় ছবি! উরি ব্বাস! কিন্তু বাংলা বই কেনা যায় একশ টাকায়—বিশেষ করে তা যদি বঙ্কিম, রবীন্দ্র, অকাদেমি বা জ্ঞানপীঠ—এ-রকম যে-কোনো একটি কুলীন পুরস্কার ছুঁয়ে যায়।

অরুন্ধতীর ভাড়া বাসায় কখনও মন খারাপ নিয়ে চলে গেলে

আরও বিষাদ নিয়ে ফিরতে হয়। একজন শিল্পী হয়ে উঠতে চাওয়া মানুষ শুধুই রিটাচার। দালাল। ডিলিং-এর ওপর টু বা থ্রি পার্সেন্ট কমিশন।

বসাক আলয়-এ কলেজ ছুটিতে কখনও যদি আসে অরুন্ধতী, তখন কমলনয়নী বসাক পাশের ঘরে। শেষ লুচির টুকরোটি ক্ষীরের মনোহারিণী স্বাদে নিজের ভেতর ডুবিয়ে দিতে দিতে বুলু টের পেল জীবন আসলে এক গাছের নাম। যার শিকড় রোজ রোজ সরসতায় গভীর থেকে গভীরে নেমে জীবনের অনেক, অনেক রস তুলে আনতে পারে। লুচি-ক্ষীরের আরামে বুলুর চোখ বুজে আসছিল।

দু'গুলি আফিং নেয়ার পর ছাদে, জ্যোৎস্নায় তুষার বসাক একা একা পায়চারি করছিলেন। আজ সুদিন মল্লিকের বৈঠকখানায় দাবা তেমন জমল না। তুষারের মনে পড়ল এ বাড়ির খুব কাছেই জীবনের শেষ দিনগুলোতে ভাড়া থেকে গেছেন রবীন মজুমদার।

তাঁর ঘরের সামনে বাঁধানো এক ফালি উঠোন ছিল। তারপর ঘর। '—কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে—', 'এই কি গো শেষ দান বিরহ দিয়ে গেলে'—'কবি,' 'গরমিল' 'শাপমুক্তি', রবীন মজুমদারের হাসি, গোঁফ, কথা বলার ভঙ্গি—আমরাও তো একসময় ফলো দিয়েছি, যেমন প্রথমেশ বড়ুয়াকে। রবীনবাবু আসতেন এ আড্ডায় মাঝে মাঝে।

শেষ জীবনে বিশ্বরূপায় নাটক করতেন। পাতলা হয়ে আসা, শাদা চুল মাথায়। একটু জুলপি। গোঁফ। সবই পাকা।

ভেঙে যাওয়া চেহারায় মরফিন নামের বিষ ফুটে বেরচ্ছিল। পরনে শাদা পাঞ্জাবি-পাজামা। রাস্তা দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে হেঁটে যেতেন—'শাপমুক্তি'র নায়ক-গায়ক।

এ-বাড়ির ছাদে এখনও ময়ূরের জালঘেরা খাঁচাটি আছে। পাখি নেই। বড় শখ করে পুষেছিলেন তুষার। এক জোড়া। একবার ডিমও দিল। বর্ষায়, ছাদের ওপর, আরও একটু দূরে, অন্ধ গলির মাথায় মেঘ জমে এলে ময়ূরের পেখম যেত খুলে। তার গলাছেঁড়া তীক্ষ্ণ ডাকে গোটা পাড়া বুঝতে পারত এই এলো, বর্ষা এলো।

সেই ভাঙা খাঁচার পাশে, জং-ধরা লোহার তার, বৃষ্টিতে পুরনো, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাঠের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুষার তার শেষ যৌবনকে দেখতে চাইছিলেন। এই জ্যোৎস্নায়, আকাশ বড় অমলিন, পাশে ত্রিপল ঢেকে দিয়ে ছোটভাইয়ের রান্না, বসার ঘর। বাড়িতে আর জায়গা নেই। সবাই হাঁড়ি আলাদা হওয়ার পর তিনতলায় নতুন করে ঘর তোলার জন্যে প্ল্যান পাস ইত্যাদি কর্পোরেশন ঝামেলায় যেতে চায়নি মিহির। বাঁশ আর ত্রিপল দিয়ে পার্মানেণ্ট প্যাণ্ডেল। তার নীচে রান্না। সরু প্লাই দিয়ে অন্য-পাশে বসার জায়গা।

এই চাঁদের আলোর তুষার হঠাৎই যেন আঙুরবালার গলায় গেয়ে ওঠা—'ওগো তোমার পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল—' এমন গানের লাইন শুনতে পেলেন।

এই তো মনে হয় সেদিন সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে আঙুরবালার বাড়ির দোতলায়, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে, সামনে লাল মেঝে। ভেতরের ঘরে বড় আয়না। একটা কাঠের বড় জলচৌকি ধরনের জায়গায় রেকর্ড আর রেকর্ড। কাচের চৌকো বাক্সের ভেতর গোল্ডেন ডিসক্। বড় ফ্রেম-বাঁধানো রঙিন ছবিতে তানপুরা হাতে আঙুরবালাদেবী।

বেগম আখতারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। ডাকতেন 'জানি' বলে। আখতারি বাঈ ফয়জাবাদী মারা যাওয়ার পর আঙুরবালার মনে হয়েছিল—জানি তো এখন কবরের নীচে, অত সুন্দর শরীর, ফর্সা রং—একটু একটু করে পচে যাচ্ছে।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে গ্রীষ্মের কোনো অলস দুপুরে উঠে এলে তুষার গান শুনতে পেতেন সঙ্গে কাচের রেকাবিতে বড় সন্দেশ। মিষ্টির পর হাতে জল। ঠোঁটের জলটুকু আঁচলে মুছিয়ে দিতেন আঙুরবালা। আর খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা রোমাঞ্চিত হতে হতে তুষার বসাক বুঝতে পারতেন কাজি নজরুল নামের বড় জাহাজটি কীভাবে এখানে আটকে গেছিলেন।

কাজিদা সর্বক্ষণ পান খেতেন। হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাসতেন। আর মাঝে মাঝে নিজের মনেই বলে উঠতেন—'দে গোরুর গা ধুইয়ে'। ঐ লম্বা চেহারা। গোটা পাঞ্জাবির বুকজুড়ে পানের দাগ। তুষার ওঁর বলার ভঙ্গিতে নজরুলকে দাঁড়ান দেখতেন চোখের সামনে। ঘরে রোদ পড়েছে। এ বাড়ির একতলা, দোতলায় ভাড়াটে। ঘরে আঙুরবালার বোন ইন্দুমতী। তাঁর শ্বশুরবাড়ি কেশব সেন স্ট্রিটে। ছেলে, নাতি সব আছে। দুই বোনের হাই শুগার। ইনসুলিন নেন, মিষ্টি খান।

বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে ঢাকায় পাওয়া গেল ক্ষীরের বড মাছ। সঙ্গে ইন্দুমতীও ছিল। ওকে ছাড়া যাই-ই না কোথাও। অত বড় সন্দেশ ছাড়ি! আঙুরবালা তাঁর স্মৃতি ফেরানব খেলায় ছিলেন। —খেয়ে তো নিলাম। তারপর ইনসুলিন।

খালি গলায় 'যারে হাতে ধরে মালা দিতে পারো নাই/মনে রাখো কেন তারে'—শুনতে শুনতে তুষারের শরীব আলগা হয়ে যাচ্ছিল। এখনও কি গলা! 'জংলা'—এই নামে ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের কথা। রেকর্ড করার বহুদিন পর্যন্ত আঙুরবালা জানতেও পারেননি ও গান রবীন্দ্রনাথের। তখন তো এ রকমই হতো।

তুষার বসাক তাঁর সামনে বসা ইতিহাস দেখছিলেন। দোতলার রেলিংয়ে ঝোলানো খাঁচার টিয়া হঠাৎই ডেকে উঠেছিল। একটু চমকে তুষার বলেছিল, দু বোন মিলে থাকেন। এত বড় বাড়ি!

আমার ভাড়াটেরা খুব ভালো। বোনের নাতিরা এসে খবর নেয়। কাজের লোক আছে, বিশ্বাসী।

চাঁদের আলোয় ময়ূরের ভাঙা খাঁচার সামনে আঙুরবালার গান শুনতে পেলেন তুষার—'ছি। ছি। হেরে গেলে শ্যাম।' ভাঙা খাঁচায় তখন অনেক, অনেক ময়ূর। তাদের পেখমমেলা বর্ণালীতে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় ময়ূররা নাচছিল। সঙ্গে তুষার বসাক। তীক্ষ্ন কলাপে ছিঁড়ে যাচ্ছিল এপাড়ার বাতাস।

তুষার দেখতে পেলেন গোটা খাঁচাটি কয়েকটি ময়ূরের ডানা নিয়ে আকাশে উঠে গেল। রথ হয়ে। রথের ভেতর আঙুরবালা বসে। তুষার ময়ূরবাহন হতে পারলেন না। ছাদের উঁচু, বুক-সমান আলসে, যেখানে এক নবীন বটের চাবা, তার পাশে মিহিরের ত্রিপল ঢাকা রান্নার জায়গাটির ভুতুড়ে ছায়ার জলছাপ। তুষার বড় একা হয়ে গেলেন। আর ছাদে নয়। আর নয়। দুদ্দাড় করে তিনি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামছিলেন।

রোজই নামার সময় ইলেকট্রিক বাঁচানোর জন্যে সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে আলোর সুইচ অফ করতে করতে আসেন। ইলেকট্রিক বিল বেশি আসাব একটা আতঙ্ক তাঁর ভেতর ধীরে কাজ করে। এ-বাড়ির হাঁড়ি আলাদা হলেও মিটার এখনও একই সঙ্গে। মাসের শেষে, ভাগ করে দিয়ে দেয়া। অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে মিটার সেপারেশনের, তা এখনও এনকোয়ারির পর্যায়ে আসেনি।

প্রতিটি সিঁড়ির বাঁকে সায়েব আর্টিস্টের আঁকা শিথিলবসনা সুন্দরীরা, এদের মধ্যে রবি বর্মার কাজও হয়ত দু-এক পিস আছে। সবই পুরনো জার্মান লিথো প্রিণ্ট। কাচের গায়ে মিহি ধুলো। আজ আলো না নিভিয়েই খড়ম পায়ে তুষারের নেমে আসা। সুন্দরীরা তাঁকে দেখে শব্দহীন হাসি হেসেছিল। তুষার দেখতে পেলেন।

তিনি ছাদ থেকে নামার পরই প্রত্যেক তলায় আলাদা আলাদা কোলাপসিবল গেট টানা হবে। তালা পড়বে। একটা আস্ত বাড়ি, কয়েকটা খোপ হয়ে উঠবে। ঘরে ফিরে দেয়ালে

ঝোলানো নিজের পোষা হরিণের গলার বকলস্ আর লোহার চেনটি দেখতে পেলেন তুষার। তার গায়েও মাকড়সার জাল। নাকের কাছে চামড়ার বকলস্টি এনে বনের গন্ধ পেতে চাইলেন তুষার। রূপসী তো ছাড়াই থাকত এ বাড়ির উঠোনে। সকাল-বিকেল বাচ্চারা ভিড় করত। কাইজারের ফেলে দেওয়া ফলের টুকরো টপ করে খেয়ে নিত রূপসী। সেও তো নেই আজ বছর-পাঁচেক। দেয়ালে তার রঙিন ছবিটি। তুষার হাত দিয়ে ছবির কাচের ধুলো সরাতে চাইছিলেন।

বড় পালঙ্কে প্রথম রাতের ঘুমটি পার করে বুলুর পেচ্ছাপ পেল।

ওর পালঙ্ক থেকে মেঝেয় নামার জন্যে একটি বড় কাঠের পিঁড়ি আছে। তার ওপর পা দিয়ে সাবধানে নেমে বুলু বাথরুমে গেল।

মা বলল, আলো জ্বালিয়ে যাস।

কলঘর থেকে ফেরার পর এপাশ-ওপাশ করে, এত বড় পালঙ্কে একটি নিঘুম রাত। অন্ধকারে এক থেকে দশ, আবার দশ নয় আট সাত—এইভাবে এক অব্দি গুনে বুলু ঘুমে যেতে চাইল। চারপাশে চৌকো অন্ধকার। বুলুর মনে পড়ল জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে রামকিংকর চলে এসেছিলেন এস এস কে এম-এর উডবার্ন ওয়ার্ডে, দোতলায়। ব্রেন টিউমার। কথা বলতে ভালো লাগে না। স্মৃতি মুছে যাচ্ছে। সবটাই গহন আঁধারে। বোধহয় কোনো বর্ষার দুপুর ছিল, নাকি শীতের—এখনই স্পষ্ট করে মনে পড়ল না বুলুর। কনুই অব্দি হাতাঅলা গেঞ্জি গায়ে বসেছিলেন রামকিংকর। উডবার্ন ওয়ার্ডের দোতলায়। তাঁর গায়ে পাউডার মাখিয়ে দিচ্ছিলেন সিসটার। আঁচড়ে দিচ্ছিলেন চুল।

কিংকরদা, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে? বুলু জিগ্যেস করেছিল,

তাঁকে দেখতে গিয়ে।

দূরে, সমুদ্রের পাড়ে।

কোনো রং, কেমন রং ভালো লাগছে এখন ?

অন্ধকার। অন্ধকার দেখতে চাই। শুধু অন্ধকার।

উডবার্নের বারান্দায় তখন রোদ পড়েছে। ও'র মাথা আঁচড়ানো স্বাস্থ্যবতী সিসটার বলেছিলেন, ও'কে বেশি কথা বলাবেন না। ডাক্তারবাবু রাগ করবেন।

তবু এরই মধ্যে অন্য কেউ কেবিনে এসে—কিংকরদা ভালো আছেন ?

রামকিংকর ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ।

বলুন তো কে, কী নাম ?

আসলে সে যে কতখানি আপন রামকিংকরের সেটুকু বুঝিয়ে দিতে চাওয়া এই সংলাপে।

রামকিংকর চুপ। দূরমনস্ক, কিছুটা ছন্ন দৃষ্টিতে আমি জল খাব বলে কেবিনে লোহার খাটে, শাদা চাদরের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে পারেন।

আপনারা এখন যান। পেশেন্ট ঘুমোবে। বলতে বলতে সিসটার কিংকরদার পায়ের ওপর শাদা চাদর টেনে দেন। উড-বার্নের বারান্দায় রোদ আরও কিছুটা এগিয়ে আসে।

কলকাতা থেকে কত দূর রামপুরহাট! তুমি কেমন আছ অরুন্ধতী! একা, এই অন্ধকারে!

তখনই একতলায় অন্ধকার টানা বারান্দায় রূপসীর গলার বকলস্ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তুষার বসাক—এ-বাড়ির সবচাইতে বয়স্ক মানুষটি। চারিদিকের বাড়ির আড়াল বাঁচিয়ে চুরি করে জ্যোৎস্না পড়েছে উঠোনে, বেলেপাথরের গায়ে। কাইজার এখন ঘরের ভেতর। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ। কাজের লোকেরা সবাই ঘুমে। এখন কোনো মোহনবাগান নেই। গজ, ঘোড়া, মন্ত্রী, ড্রাবল, রি-ডাবল, পাস নেই, শুধু এক জ্যোৎস্না-ছোঁয়া অনন্ত

অন্ধকার। টানা থামঅলা বারান্দার ছবির সুন্দরীরা কাচ ভাঙার শব্দে হেসে উঠছে—ভিতু। তুমি ভিতু তুষার।

হাতে রূপসীর গলার বকলস্। সেখানে এখনও বনের গন্ধ। তুষার বসাক এই অন্ধকারে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শোয়ার ঘরে যে প্রাচীন খিলানটি, তার মাথায় রঙিন কাচের ময়ূর-পেখম ডিজাইন। তার ভেতর দিয়ে রোদ এসে পড়লে, কী এক বর্ণালী জেগে ওঠে বুলু বসাকের ঘরের ভেতর। ছাদে বারবার চুনকামে মুছে-আসা পঙ্খের কাজ। ঘরের কাচ-বসানো মেহগিনির আলমারি, তার ভেতর চিনেমাটির বিলিতি পুতুল। পোর্সিলিন, কাটগ্লাস, মেটালের কয়েকটা দোয়াত। কালেকটারদের কাছে এর খুব কদর। রঙিন কাচের বর্ণ-উচ্ছ্বাস আলমারির কাচের গায়েও। বালিশ থেকে মাথা তুলতে তুলতে টের পেল বুলু তার মাথাটি ভার হয়ে আছে। ঘুম, আরও অনেকটা, টানা ঘুম দরকার। ছাদে তখন মেজজ্যাঠামশাইয়ের পায়রাদের ডানার শব্দ। বক বকম।

চার

পল্টন দত্তের এ ঘরটিকে লুভের মিউজিয়াম বলে তিলক। গরমের সন্ধে সবে একটু একটু করে ফুটে উঠছে। দূরে নতুন বাজারে আলো, কেনাব্যাচা। চিৎপুরের ট্রাম যাচ্ছে টং টং করে। যাত্রা কোম্পানির অফিসে নায়েকদের ভিড় তেমন জমেনি। তবু রাস্তার ওপর গদীঘরে লোকজন। রবীন্দ্রকাননে হালকা সবুজের গায়ে টিউবের আলো।

ম্যাকডোয়েল-এ বরফ জল সোডা। ছোট টেবিলে পল্টন আর তিলক মুখোমুখি। ঘোষকে দিয়ে দোকান থেকে কাটলেট ভাজিয়ে

এনেছে পল্টন। পেঁয়াজ কুচি আছে। পটেটো চিপ্‌স।

কাগজের স্তূপ, দুটো ভাঙা চেয়ার, একটা হারমোনিয়ামের বাক্স—কি যে নেই এ-ঘরে। আরশোলা, ইঁদুর, কাঁকড়াবিছে। দেয়ালে লোহার স্ক্রু দিয়ে আঁটা কাঠের পাটার গায়ে লাগানো লোহার আঁকশি। তার গায়ে পল্টনের দুটি পাঞ্জাবি। ধুতি, গেঞ্জি। পাল্লা ছাড়া দেয়াল আলমারির ভেতর খবরেব কাগজে মোড়া ডাইংক্লিনিং থেকে কাচিয়ে আনানো এক সেট ধুতি-পাঞ্জাবি। একপাশে অনেকগুলো লোহার ট্রাঙ্ক—একটার ওপর আর একটা। তার মাথায় হাল ফ্যাশানের ভি আই পি। সিঙ্গল খাট একখানা। দেয়াল আলমারির একটা তাকে রঙিন কাচের কুজো। তার মুখে গায়ে ফুল আঁকা কাচের গ্লাস ঢাকা। ঘরের ইলেকট্রিক বালবে তেমন জোর নেই। সিঙ্গল খাটের মাথার কাছে সস্তার টেবিল। তাতে পেপারওয়েট, টেবিল ল্যাম্প, চা খাওয়া খালি কাপ, ডিকশনারি—এক মহিলার ছবি। মাথায় টায়রা, কপালে বড় সিঁদুর-টিপ। মাথায় মেম খোঁপা। কাঁধে আঁচল সামলানোর ভারি ব্রোচ। পল্টনদার মা—বিয়ের দশ দিনের মধ্যে তোলা। ফোটোর ফ্রেমে এই শহরের পুরনো স্মৃতি, সোনালিটুকু এখনও ধুলোয়, সময়ে পুরোপুরি মুছে যায়নি।

টেবিলে ব্লু বার্ডের প্যাকেট পড়েছিল।

তুমি এখনও এইসব ছাইভস্ম, স্মোকিং কাফটাও তো গেল না। তিনটে কথার ফাঁকে একবার কাশি। বলতে বলতে তিলক গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিল।

কি আর হবে! বড় জোর একটা ক্যানসার। নয়ত একটা স্ট্রোক। নিমতলায় চলে যাব। তবে আমায় কাঠে দিও বাবা। তোমাদের ঐ ইলেকট্রিক—

না-রোগা, না-মোটা এমন চেহারা, মাঝারি হাইট। মাথার চুল কুচকুচে কালো। দেখলে মনে হবে এই বুঝি স্নান সেরে, বিলক্রিম মেখে ভালো করে চুল আঁচড়ে এলো। পরিষ্কার কামানো

গাল। এখন গায়ে কনুই অব্দি হাতাঅলা বোতাম দেয়া গেঞ্জি, সরু কালো পাড়ের ফাইন মিলের ধুতি। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। হাতে ড্রিংকস। টেবিলের ওপর কুড়িটা থাকে এমন সিগারেটের প্যাকেট। পল্টন হয় 'জেনারেল' খাবে। নয়ত 'ব্লু বার্ড'।

কেউ জিগ্যেস করলে এককথার উত্তর—ব্লু ব্লাড, তাই ব্লু বার্ড খাই।

একটু দামি সিগারেট খাও। না হলে গলায় বড় লাগে। বলতে বলতে নিজের আদ্দির পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে ক্লাসিক বের করে লাইটারে জ্বালায় তিলক। অ্যালকোহল, তামাক—ঘরের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। এমনিতেই এ-ঘরের হাওয়ায় একটি পুরনো স্যাঁতসেতে গন্ধ সব সময় মিশে থাকে। তার সঙ্গে এই মিশ্রণটুকু—

পল্টন দত্ত একটু গলা তুলেই ডাকে—ঘোষ। ঘোষ।

আঁজ্ঞে যাই হুজুর।

সোডা দিয়ে যাও।

আচ্ছা, তোমার বন্ধু কল্যাণাক্ষর কি খবর?

ভালোই আছে। ফার্স্ক্লাস। সেই বসুমতীতেই রয়ে গেল। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ি নিয়ে বড় কাজটা করল না। অথচ ও যা জানে—বহু অ্যানেকডোবস। আর কি ফোটোগ্রাফিক মেমারি। বাবা করঞ্জাক্ষবাবু ছিলেন এল সালভাদোরের কন্সাল। কবি। মা মারা গেল ছোটবেলায়। তারপর যা হয়। কল্যাণটাও একসময় ভালো কবিতা লিখত।

তোমার সঙ্গে আলাপ--সেও তো—

অনেক দিন। অনেক দিন। দীপ্তেন সান্যালের অচলপত্রের আড্ডায়। 'অচল'-এর আড্ডায় কল্যাণাক্ষ নিয়মিত। কেমন আছ কল্যাণ? জিগ্যেস করলে উত্তর—ম-টা বাদ দিয়ে বল না। দারুণ সুপুরুষ। বাবার মরিস ফাইভ। নিজের ওপেল। ওর কাপ্তেনি আটকায় কে?

ঘোষ টেবিলে সোডা রেখে গেল।

ঘোষ, তুমি এঁকে চেন?

ঘোষ ঘাড় নাড়ল পল্টনের প্রশ্নে।

বল তো কে?

ইনিই তো সেই দিব্যকান্তি তিলকবাবু।

হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ তিলক আর একটু হলে ড্রিংকসে বিষম খেত। —তোমার স্টকও দারুণ। জোগাড় করেছ বটে এক পিস, বলতে বলতে ড্রিংকসের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখল তিলক।

ঘোষও কিন্তু সাপ্লায়েড বাই কল্যাণাক্ষ। না হলে এমন বাংলা বলে। 'হুজুর' ছাড়া কথা বলবে না। বাবু, দাদাবাবু, পুরনো অ্যারিস্টেক্রেসি, ব্লু ব্লাড—বলতে বলতে পল্টন ততক্ষণে নতুন সিগারেটে চলে যেতে পেরেছে।

এ পানে দীর্ঘ বিরতি ছিল না। ফাঁকে ফাঁকে কথা মিশে যাচ্ছিল। বড়—পাতিয়ালা পেগ, তিনটে নেওয়ার পর পল্টন সুধীন্দ্রনাথ দত্তে চলে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পরই তার প্রিয় কবি। 'উটপাখী', 'অর্কেস্ট্রা', 'সংবর্ত'।

> 'এ ভুজ মাঝে হাজার রূপবতী
> আচম্বিতে প্রসাদ লভিয়াছে
> স্বর্গ থেকে দেবীরা সুধা এনে
> গরল নিয়ে নরকে চলে গেছে।'

আচ্ছা বল তো দীপ্তেন সান্যালের পানিং, দীপ্তেনিয়ানা এ সবের সঙ্গেই তো আমাদের জানাশোনা কিন্তু দীপ্তেনদার ঐ লাইন—

> 'যত খুশি খাও কালিয়া পোলাও
> আমার জন্যে ঘণ্ট
> তোমরা সবাই সুধাটুকু নাও
> বিষ নেব নীলকণ্ঠ'

পড়েছিস? সবটা ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বলতেও পারলাম না। আজকাল মেমারি ফেল করছে।

তিলক মাথা নাড়ল। দীর্ঘ দিল্লি প্রবাস তাকে সস্তা ইংরেজি থ্রিলার-প্রেমী করেছে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বড়জোর—তাও দু-একখানা। বই পড়ার তেমন কোনো নেশা নেই।

হাতের টাইটান কোয়ার্জে রাত নটা। তিলক ডিলু-এর কথায় ফিরতে চাইছিল।—তুমি তা-লে যামিনী রায়টা দেখে দেবে!

দেব। কী খাওয়াবি?

স্কচ। আর যা খাবে।

গন্ধলেবু দিয়ে ভাত, মুসুর ডাল। পাতলা করে কাটা কড়া করে ভাজা মুড়মুড়ে আলুভাজা। আর মাংস—মাটন। এই শালা ব্রয়লার চিকেন কেমন যেন ভেজিটেবল মনে হয়।

তুমি ছবি দেখে দিলে কত নাও?

অ্যাপিয়ার হলেই দু হাজার। বোথ পার্টি ওয়ান। তারপর ডিলিং হলে তার ওপর টু পার্সেন্ট। সে তুই ভাবিস না।

নাহ, ডিলিং ইজ ডিলিং।

এ-ঘরে ঢোকার আগে লিটনদার কথা মনে এসেছিল তিলকের। পল্টনের যমজ। নাকের ডান পাশে বড় তিলটি ছাড়া পাশাপাশি দু জনকে দেখলে কে কোনজন বলা শক্ত।

লিটন আছে শেয়ার মার্কেট নিয়ে। ব্রোকারি। এই গোল-মেলে বাজারে তেজিমন্দীর খেলায় বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। সরু একফালি ছাদের ওপাশে লিটন দত্তের ঘর। এখন তালা।

আমাদের চিৎপুরের ভাদরমল, বুঝলি! নিজের যমজ ভাইটি সম্বন্ধে এমন কথা বলে দিতে পারে পল্টন। তিলকের জিজ্ঞাসার জবাবে। ভাদরমল আসলে সে-কলকাতার শেয়ার মার্কেটের বড় ব্রোকার।

তোমার নাকের ডানপাশের তিলটা ছাড়া···

আইডেনটিকাল টুইন তো এমনই হবে। এ আর অবাক হবার কী!

তুই সুভো ঠাকুরের সঙ্গে মেশ। তোর বাবার বন্ধু ছিল। দরকার হলে আমি বলে দেব। মানুষ দেখবি একখানা। কলকাতার শেষ বোহেমিয়ান, রোমাণ্টিক। যেমন ভদ্র, তেমন আড্ডাপ্রিয়। আর চোখ! ধুলোর পাহাড়ের মধ্যে যদি কাজের জিনিসটি থাকে উনি খুঁজে নেবেন। ফোক আর্ট জানেন। নিজে বড় পেইণ্টার। কিন্তু ওই যে বললাম প্রতিভাবান একসেনট্রিক। হঠাৎ খেয়াল হলো জনাইয়ে ফোক আর্ট মিউজিয়াম করবেন। বিশাল জমি কেনা হলো। সেখানে গয়ার বোধিবৃক্ষের চারা গেল। আঙুরলতা, তেজপাতা, চন্দনগাছ। ভেঙে ফেলা সিনেট হলের থাম। স্ত্রী, আরতি বৌদি—তখনও আরতি বৌদি দিল্লিতে গিয়ে ইংরেজি কাগজগুলোর আর্ট ক্রিটিক হননি, দুই ছেলে সুন্দরম আর সিদ্ধার্থ, মেয়ে চিত্রলেখা—পুপু, সবাই মিলে তাঁবুর ভেতর।

সুভোদার কাছে শুনেছি—ঘোষ, সোডা—

আমি আর খাব না পল্টনদা।

আমার কোটা এখনও কমপ্লিট হয় নি। কোটা তো ফিনিশ করতে হবে বাবা। বলতে বলতে পল্টন দত্ত নতুন ব্লু বার্ড-এ চলে যেতে পারে। তারপর ধোঁয়ায়, অ্যালকোহলে, পল্টন দত্তের নিজস্ব বর্ণনায় তিলককে দেখিয়ে দিতে পারে জনাইয়ে তাঁবুর নিচে সপরিবারে সুভো ঠাকুর। দু চোখে ফোক আর্ট মিউজিয়াম গড়ে তোলার স্বপ্ন। চারপাশে ধু-ধু মাঠ। মাঝখানে কিছুটা গাঁথনি। দূরে কোনো বিল থেকে চুনোমাছ ধরে দিয়ে গেল কেউ। তা ভাজার গন্ধ আসছে তাঁবুর থেকে। প্রায় রোজই ওপন এয়ার পিকনিক।

তুই অ্যাণ্টিক করবি, সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আড্ডা দিবি না, সে তো হতে পারে না। বলতে বলতে পল্টন দত্তের কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এই তিনমহলা বিশাল দত্ত ক্যাসেল-এর একতলায় এখন যাত্রার রিহার্সাল। তার শব্দ এই ছাদের ঘরে পেঁছয় না।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, সুভোদার কাছে শুনেছি, জনাইয়ে তাঁবু

খাটিয়ে আছেন। কাছেই জলার থেকে চুনোমাছ ধরে এনে দিলেন এক মহিলা, ঐ গ্রামেই থাকেন—জনাই তো গণ্ডগ্রাম তখন। সেই চুনোমাছের চচ্চড়ি আর ভাত—সুভোদা খাচ্ছেন, হোল ফ্যামিলি নিয়ে। একটাই স্বপ্ন—ফোক আর্ট মিউজিয়াম তৈরি করবেন। বলতে বলতে পল্টন জোরে বিষম খেল।

এ-বাড়ির নাচঘরে যাত্রার মহলা। তার পাশে চাকর-দাসীদের ঘরে বিস্কুট, আলতা আর আলকাতরা কোম্পানির গোডাউন। নিচে চাকরদের খানদুই ঘর আছে। দাসীরা এখন যারযার বাবু-মায়েদের কাছাকাছি।

পেছনের অন্ধকার, সরু সিঁড়িতে আলো নেই। কাঠের রেলিং ধরে রাস্তায় নেমে এলে ডান দিকে একটা বেসন ভাঙানোর কল। তারপরই ফুলুরি, চায়ের দোকান। ফুলের বাজার। নতুন বাজারের আলো। গলি থেকে রাস্তায় উঠে এলেই চিৎপুরের ট্রামলাইন। সেখানে এসে তিলক একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

পাঁচ

এ-বাড়ির আর্কিটেকচার সম্ভবত কোরিন্হিয়ন। বাথরুমেও একসময় ইটালিয়ান মার্বেল ছিল। ভেনিসের আয়না ছাড়া বাবুরা মুখ দেখতেন না। বিলিতি কাট গ্লাসে টলটলে ফরাসি সুরা। এ-বাড়িতে রবি বর্মা, হেমেন মজুমদার, এমন কী অতুল বসুর আঁকা সুন্দরীরা ছিলেন। ঠাকুরদালানে দুর্গোৎসব, কাঙালি ভোজন। একশ আটটা পাঁঠা বলি।

দত্ত ক্যাসেল-এ ঢোকার বড়দেউড়ির মাথায় এখনও জোড়া সিংহ। তাদের থাবার নীচে পৃথিবী। সময়, পলেস্তারা, চুনকাম তাদের দাঁত ও নখের হিংস্রতা কমিয়ে আনতে পেরেছে। আর তো বৃটিশ-সিংহ বন্দনার দরকার নেই। নহবতখানায় এখন ভাঙা কাঠ-কাটরার গোডাউন। সেখানে চামচিকেদের অবাধ ঘরসংসার।

আর কয়েক ঘর গোলাপায়রা।

শরিকানি বাড়ি ভাগ ভাগ হতে হতে, লিজ বদল করতে করতে কোথায় কোথায় কত টুকরো যেন হয়ে গেছে। ছাদের কার্নিশে বট-অশ্বত্থ। তিনতলার এই চিলেকোঠায় পল্টন দত্তের ঘুম একটু দেরিতেই ভাঙে। শুতে রাত হয়। ঘুমোতে আরও। ঘোষ বেড টি দিয়ে যায় সাড়ে নটা নাগাদ। র-টি, উইথ লিমন। উইদাউট শুগার। আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট পর আবারও একবার কালো চা। বাথরুম সহজ হওয়ার রেসিপি।

এ-ঘরে সকালের দিকে রোদ আসে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলো গেলে গরমের দিনে ঘর তেতে উঠতে থাকে। তখন আর থাকা যায় না। পালাই পালাই করতে হয়। শীতে একেবারে উল্টো ছবি। সকালে এক-আধ ফোঁটা রোদ্দুর। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের স্যাঁতসেঁতে হিম হাড়ে জড়িয়ে যেতে থাকে। তখনও পল্টনের কিচ্ছু করার থাকে না।

কাল সারা রাত কাশি হয়েছে। বিশ্রি স্মোকিং কাফ। ঘং শব্দে। আজ সকালেও চিত হলেই কাশি হলেই কাশি। সিগারেট ফুরিয়েছে। দাড়ি কামাতে হবে। খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়িতে নিজেকে আয়নায় আরও বুড়ো মনে হয়। পিতা নবীন দত্ত। তস্য পিতা লালমোহন দত্ত। আমরা এভাবে বাবার দিকের সাত-পুরুষের নাম মুখে মুখে বলে যেতে পারি। কিন্তু মায়ের দিকে —কাত্যায়নী দত্ত, তস্য পিতা—মনে রাখার রেওয়াজ নেই। দায়ও নেই। ওসব খাতাপত্তর ভচ্চাযিদের কাছে জমা আছে। তারা সাতপুরুষকে জল দেয়ার সময়—মহালয়ার তর্পণে, মনে করিয়ে দেয়।

আর কি, নবীনলোচন দত্তের বংশধারাটি এখানেই শেষ। আমি পল্টন দত্ত ব্যাচিলার। ভাই লিটন দত্ত, তার একটি কৃষ্ণপক্ষ আছে। সন্তানাদিও। কিন্তু তারা তো আর পিতৃপুরুষকে জল দিতে পারবে না। ভাবতে ভাবতে কাশির দমকে বিছানার ওপর

কং‌করে গেল পল্টন। তারপর শব্দ একটু কমলে, ঘোষ ঘোষ বলে ডেকে উঠে, সামান্য হাঁপিয়ে, ঘোষ সামনে এলে—আমায় জল দাও। আর সিগারেট নিয়ে এস, বলতে বলতে চিত হয়ে শুল।

মাসের একটা থোক টাকা ঘোষকে দেয়া থাকে। তা থেকেই ও বাজার করে, সিগারেট আনে, মদ। এ-পাড়ায় ক্যাসেল-এর ছেলেরা কখনও দোকানে-বাজারে যায় না। আগে বাবারা যখন মোসাহেব নিয়ে ফুর্তিতে যেতেন, টাকা থাকত সরকার-আমলা, নয়ত চাকরের কাছে। নিজেরা একটা আধলাও রাখতেন না।

শেষ রাতে ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ব্রাউনবেরির চাকার শব্দে, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে এ-পাড়ার রাস্তা চমকে চমকে উঠত। পাহারা-ওয়ালা পথ ছেড়ে দিত সম্ভ্রমে। বাবুরা ফিরলেন।

আমি উঠলেই ঘোষ ব্রেকফাস্ট দেবে। টোস্ট, মাখন আর মরিচ দিয়ে। ডাবল ডিমের অমলেট, নয়তো পোচ। এখন তো আর ওভালটিন পাওয়া যায় না। তাই হরলিকস এক গ্লাস।

খুব ইচ্ছে ছিল কবিতা লিখব। তারপর দেখলাম যাত্রাপালা লিখলে ভালো পয়সা। সত্তর দশকের প্রথম দিক থেকেই তো নতুন করে যাত্রার রমরমা। পালা লিখতাম, রোজগার হতো। গত দু-তিন বছর একেবারেই বদলে গেছে পালার মেজাজ। আগে গদিঘরের মালিকরা বলতেন, বোম্বাই ফিল্ম দেখুন। সেলিম জাভেদের গল্প। তিনটে মারপিট। ছটা অ্যাকশন। চারটে লাভ সিন। দুটো ডান্স। তাতেই চলবে। হই হই করে চলবে।

এখন তাও খাচ্ছে না। তাই পালা লিখে খরচা চলে না। কবিতা তো কবেই বাদ হয়ে গেছে। ইদানীং কলকাতা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শাল, জামেয়ার, কাঁথা, বালুচরি শাড়ি, বেনারসী—পুরনো কিছু আর থাকবে না। একটু পুরনো কাচের পেপার-ওয়েট, চিনেমাটির বা কাচের বিলিতি পুতুল, রুপোর সিঁদুর কৌটো—সব নিয়ে যাবে দুপুরে আসা স্টেনলেস স্টিল বাসন-

ওয়ালিরা।

বড় ডিল করিয়ে দিলে কমিশন পাই। ক্যাসেল-এর ছেলে বলে সবাই জিনিস চেনাতে নিয়ে যায়। গাড়িতে যাওয়া-আসা। এর জন্যে আলাদা ফিজ্ আছে।

কলকাতায় অ্যান্টিক কেনাব্যাচা শুরু হয়েছিল সেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলেই। এ-বাংলার অনেক কিছুর মূলেই যেমন ঠাকুরবাড়ি, এ ব্যাপারেও তেমনই। দ্বারকানাথ সত্যিকারের শিল্পবোদ্ধা ছিলেন। তাঁর কালেকশনে ছিল জন কনস্টেবল-এর আঁকা 'ওয়াইলড অফ সাসেকস' আর 'ম্যাডোনা'—সেটা বোধহয় রাফায়েলের। এটা এখন জগদীশ সিংহের কালেকশনে। জোড়াসাঁকোর মতোই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরেরাও ছিলেন আর্ট আর অ্যান্টিকেব বড় পেট্রন। মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, যাঁকে বলা হতো রুবি প্রিন্স—এ নাম দিয়েছিলেন বিলেতের রানী, তাঁর কালেকশনে ছিল নাকি রাশিয়ার জারের ঝাড়বাতি। আরও অনেক, অনেক দেশি-বিদেশি পেইন্টারদের ছবি, আর্ট অবজেক্ট—এমন ভাবনার মাঝেই কাশির দমকে পল্টনের বুক শুকিয়ে আসে। ঘোষ ততক্ষণে নতুন সিগারেট নিয়ে এসেছে।

তখনই লিটন নিজের ঘরে শেয়ারের ওপর—কলকাতা আর বোম্বে থেকে আসা ইংরেজি কাগজের ফিনানসিয়াল পেজ দেখছিল। বোম্বের কাগজগুলো সবই বাসি। তারও কাজের একটি লোক। ঘর বোঝাই খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে। সবই কোম্পানি, শেয়ার বাজার, আর্থিক ঝুঁকি ও লাভের খবর ছাপা অক্ষরে গায়ে লাগিয়ে রেখেছে।

তামাক-বিলাসী লিটনের পাইপটি পড়ে আছে টেবিলের ওপর। পাশে 'ফ্লাইং ডাচ ম্যান'-এর কৌটো। পাইপ পরিষ্কার করার সরঞ্জাম। নলের ভেতর তামাকের টুকরো আটকেছে। আর তখনই কাশতে কাশতে পল্টন তার যমজ ভাইয়ের ঘরে এসে বলল, একটা সিগারেট দে তো। জাস্ট ভ্যারাইটি, একটু ব্রেক। মুখটা

পাল্টাব।

বাংলাদেশ থেকে আনানো লাল রঙের জন প্লেয়ার-এর প্যাকেট উঠে এলো লিটনের হাতে। ড্রয়ারের ভেতরে ছিল। সাঁইত্রিশ টাকা প্যাকেট। একটা সিগারেট নিয়ে পল্টনকে দিল লিটন। পল্টন চলে যাওয়ার আগে জিগ্যেস করল, কী খবর তোর শেয়ার মার্কেটের? তুই কি এখনও 'বুল্' আছিস, না 'বেয়ার'।

আমি বরাবরই 'বুল্', 'বেয়ার' তো নই-ই। 'স্ট্যাগ'-ও না।

পল্টন সিগারেট নিয়ে ধরানোর ফাঁকেই একবার কেশে নিতে পেরেছে।

লিটন তার দিকে একবার তাকাল। তুই কি জানিস, নাইন-টিনথ সেঞ্চুরির যে দুজন বড় বাঙালি শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নি করেছিলেন, তাঁদের নাম—রাজা রামমোহন রায় আর রানী রাসমণি।

পল্টন ঘাড় নাড়ল। তারপর এ-ঘরের বাইরে বেরিয়ে খোলা ছাদের স্পেসটুকুতে। ভালো কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম, হয়নি। যাত্রার পালা যা লিখি, তা এখন আর কেউ তেমন আগ্রহ দেখায় না। নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে, পেছনের অন্ধকার সিঁড়ি পেরিয়ে দোতলার মহল। তারপর একতলায় নাচঘরে, বড় বড় আয়না, ঝাড় লণ্ঠন, অয়েল পেইনটিং। ছিঁড়ে আসা, ধুলোমাখা কার্পেটের ওপর যাত্রাদলের মহড়া। আলতা, আলকাতরা ঠেলা-গাড়িতে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া, দিয়ে যাওয়া।

ছাদে দাঁড়ালে দূরে দূরে ট্রাম লাইন। একটা ঘাস মরে যাওয়া পার্ক। ল্যাম্পপোস্ট। রাস্তা দিয়ে চলা মানুষ। ফুটপাথ। সে দিকে তাকালে নিঃসঙ্গ পল্টনের মনটা হু হু করে ওঠে। এত আলো, ভিড়, মানুষজনে—কিন্তু এই বড় বাড়ি থেকে বোঝার উপায় নেই। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পল্টনের মনে হলো ঘরে ফিরে পড়তে বসা দরকার। কিছু পুরনো ফোটোগ্রাফ। পারিবারিক ছবি—নাড়াচাড়া দরকার।

রাতে একা একা মাঝে মাঝে এরকম খেয়াল চাপে পল্টনের। ছবির বাণ্ডিল থেকে সুন্দরী নারীরা—এমনকি ভারতের একদা প্রধানমন্ত্রী যৌবনের ইন্দিরা, নার্গিস, মধুবালা, সুচিত্রা সেন। এত ছবি, পোকা কাটে, উইয়ে দাগ দেয়। ঘাঁটতে ঘাঁটতে কাগজের কাটিংস, ক্লিপিংস, অ্যান্টিকের খবর, কেনাব্যাচা। বড় পরিবারের —রাজা-রাজরার, ডিউক-ডাচেস, কিং-কুইনদের বিয়ে, বিয়ে ভাঙা —বংশ-তালিকা, বংশ-কারিকা—সব পল্টন দেখতে থাকে। প্রেম পরিণয়, ছাড়াছাড়ি, কেচ্ছা, উত্তেজনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ধুলো ওড়ে। কাশি আসে। পোকা পালায়। আরশোলা ওড়ে। নানান খবর নতুন খবরে চাপা পড়ে। গোছানো হয় না। আবার নতুন কাগজ। কত রাখা যায়!

পল্টন ডাকে—ঘোষ। ঘোষ—

আঁজ্ঞে যাই, হুজুর—

করো কি, ধুলো ঝাড়তে পারো না—শিগগিরি এস—

বেশি ঘাঁটবেন না হুজুর কাঁকড়াবিছে থাকতে পারে। কাল স্প্রে করে দেব।

থাক কাঁকড়াবিছে। ময়াল সাপও থাকতে পারে। যা অবস্থা হয়ে আছে। ধুলোয় দম বন্ধ হয়ে আসে। পল্টন কাশছিল। ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রায় সাত আট বছরের পুরনো শারদীয় দৈনিক বসুমতীর একটা কাটিংস, দশ এগারো পাতা—এটা কেন রেখেছি! আরে, সুভোদার ওপর—সুভো ঠাকুরের ওপর লেখা—বায়োগ্রাফি। তাইতো—এ জন্যে রাখা। কল্যাণাক্ষ লিখিয়েছিল একটি নতুন ছেলেকে দিয়ে—ছেলেটির নাম কিন্নর রায়—কল্যাণাক্ষ পারেও। সুভোদা বহু আগে আমাকে বলেছিলেন, পল্টন মনে করার চেষ্টা করল—ভাই আমাদের বংশতালিকা, বংশলতিকা সব মুখস্ত কল্যাণাক্ষর। তারপর নিজের পাকা দাড়ির ভেতর হাসি চেপে রেখে সুভো ঠাকুর বলেছিলেন, চলুন, খিচিং ঘুরে আসি। নয়ত ম্যাকল্যাক্সিগঞ্জ। নিদেনপক্ষে গাদিয়াড়া।

খিচিং কোথায় সুভোদা, পল্টনের প্রশ্ন।

ওড়িশায়। আরে মশাই ওড়িশাতো আমাদের জমিদারি ছিল।

'সংস্কৃতি জগতের এক সব্যসাচী নায়ক'—লেখাটির নাম। পল্টন পড়ল।

সকালবেলার আলো

ঘুম থেকে উঠতে হতো ঠিক ঠিক চারটেয়। ঘড়ির অ্যালার্মে তখন ট্রিনির ট্রিনির। ছিল না কেউ ডাকার। উঠতে দেরি হলেই নাকে স্মেলিং সল্ট। জোড়াসাঁকোর ছ' নম্বর বাড়িতে এভাবেই আসত সুভো ঠাকুরের ভোর।

তক্তাপোশে ঢালা বিছানা। তার ওপর ছোটরা। মাঝে মাঝে পাশবালিশের দেয়াল। বড়রা শুতেন পালঙ্কে।

উঠেই জামা-কাপড় ছাড়া, চান-ঘর, মুখধোয়া। ছ নম্বর বাড়ির তেতলার ছাতের এক জায়গায় উপাসনা। নানা রকম ব্রাহ্ম ধর্ম পাঠ সুর করে। দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা পার।

ছ-আট বছরে শুরু নিয়মিত উপাসনা। শিরোমণিমশাই পড়াতেন, দেখিয়ে দিতেন উপাসনা-মন্ত্রের শব্দ-সুর-তান। দশ বছর থেকে নিজে নিজেই উচ্চারণ।

'পরম-পিতা' আহ্বান শেষ। নেমে একতলায়। ওখানে কুস্তির আখড়া। ছিলেন চৌবেজি। তাঁর কাছে শিখতেন পালোয়ানী প্যাঁচ। একা নন, সঙ্গে থাকতেন ভাই টুভো (সিদ্ধিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। অনেক সময় মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি, সুরেন কাকার ছেলে প্রবীর, মিহিরও। শুধু কুস্তি-ই নয়, ডন-বৈঠকও। যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী, আসত শুধু তারাই। ও'রা তখন জোড়াসাঁকের লালবাড়ি—বিচিত্রা ভবনের বাসিন্দে।

চৌবেজির হাত থেকে ছাড়া পেতেন যখন, তখন বাড়ির ঘণ্টা-ঘড়িতে সাতটা বেলার আওয়াজ। কলকাতার রোদ্দুর বড়-বাড়ির

এ-থামে ও-থামে, উঠোনে।

এর পর খাওয়া-দাওয়া। শীতকাল হলে আখরোট, পেস্তা-বাদাম, দুধ। টোস্ট, স্ক্র্যাম্বেলড এগ, ওভালটিন। চা-এর চল তখনও তেমন হয়নি। বড়রা খান একটু-আধটু, কখনও কখনও গরমের দিনে সকালের খাবার ছোট লুচি, মশলা ছাড়া শাদা তরকারি, আদার কুচি, অঙ্কুরিত মুগ। ছোটদের দুধে এক-আধ চিমটে চা দেয়া হতো ফেলে, কোনো কোনোদিন।

তের-চোদ্দ বছরে প্রথম ইস্কুল। অনেকবার বদল হয়েছে তার নাম। সববার আগে ভর্তি হয়েছিলেন জোড়াসাঁকো হাইস্কুলে। বারাণসী ঘোষ সেকেণ্ড লেনের ওপারের এই স্কুল থেকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন যেখানে। সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ। তারপর রানী ভবানী। এর পরে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল।

স্কুলে যাওয়ার আগে অব্দি ফাঁকি ছিল না ঘড়ি ধরা রুটিনে। তারপরই কুস্তিতে কামাই, আরও এদিক-ওদিক। সে কথা পরে।

খাওয়ার পরই পড়া। বাড়িতে আসতেন মাস্টারমশাই। মনে নেই তাঁর নাম। সবাই ডাকতেন পুরনো মাস্টারমশাই। দশটা অব্দি পড়ালেখা। সব সাবজেক্টই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

পড়ার পরই তেলমাখা। চাকর ছিল, সর্ষের তেল নিয়ে সারা গায়ে যত দলাই-মলাই তাদেরই। শীতের দিনে গায়ে মাখাত সর-ময়দা। সর-ময়দা আর কমলালেবুর খোসা বাটা। তাতেই উঠে যেত গায়ের সব তেল। সাবানের বদলে বেসন মাখাত। গা-হাত-মুখ দিব্যি পরিষ্কার।

শীতে জল রাখা হতো ছাদে। রোদ্দুরে তেতে উঠত চানের জল। তারপর সারা মাথায়-গায়ে।

খাওয়া-দাওয়া, চান, বেড়াতে যাওয়া শোয়া—সবই চাকর-দাসীদের হাতে। সেখানে না বাবা, না মা। ছোটবেলায় কাপড় বদলে দিত দাসীরা। বড় হলে চাকর! দুপুরের খাওয়া পরি-

বেশন করতেন বামুনঠাকুর। খাইয়ে দিত চাকরে।

দুপুরে খাওয়া আসন পেতে। ভাত, মাখন গলানো ঘি, চচ্চড়ি, মাছভাজা, ডাল, মাছের তরকারি, দৈ। চোদ্দ বছর অব্দি রাতেও লুচি, দুধ আর আলুভাজা।

আরও বড় হলে সবাই মিলে ডিনার টেবিলে। রান্না বাবুর্চির। তার মেনু আলাদা।

বাইরে তেতলার ছাদে লুকোচুরি, কুমিরডাঙা—খেলাধুলো বলতে এসবই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি-নাতনিরা ছিলেন খেলার সঙ্গী। স্বরীন্দ্রনাথ, অজীন্দ্রনাথ। ও'রা ছিলেন পাঁচ-ছ' বছরের বড়, তবু খেলতেন। সঙ্গে স্বরীন্দ্রনাথের ছোট বোন চিত্রা (বুজি)-ও। এই বাইরের তেতলার ছাদেই রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবী বাগান করেছিলেন। বসাতেন কবিতা পাঠের আসর। কত স্মৃতি, ইতিহাস। সেসব কি আর মনে আসত তখন!

জোড়াসাঁকোর ছ নম্বর বাড়িতে সুভো ঠাকুর ছিলেন আঠাশ বছর অব্দি। উঠোনেব উত্তর-পুব কোণের এই অংশে ছিল নীলমণি ঠাকুরের আদি ভিটে। ছ' নম্বরের অন্যান্য বাসিন্দারা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের ছেলেরা। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছেলে। মাঝখানে বিশাল উঠোন। চারপাশে বড় বড় থামওয়ালা পেল্লায় বাড়ি। ঘর। বারান্দা।

ও বাড়ির ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ আর সুভগেন্দ্রনাথ মুখোমুখি। উঠোন পেরলেই রবীন্দ্রনাথ।

ছাদে খেলাধুলো বিকেলে। বেড়ানোও সেখানে। কোনো কোনো দিন দাসীদের সঙ্গে বড়জোর দেউড়ি অব্দি হেঁটে আসা। তার বাইরে যেতে মানা। যেন লক্ষ্মণের গণ্ডী। বিশাল সিং-দরজা পেরিয়ে বাইরে যাওয়া মানেই এক উৎসব।

যাওয়া হতো নিউ মার্কেট, কিনতে-কাটতে। সঙ্গে চাকর। কাপড়-জামা, জুতো তরকারি, সবই নিউ মার্কেট থেকে। কনভেণ্ট

রোডে মামাবাড়ি, গিয়ে অবিশ্যি রাত্রিবাস দু-এক বারই। হয়ত খুব ঝড়জল, সেজন্যেই। কলকাতায় পালকি চড়েছেন সুভো ঠাকুর। খুব বৃষ্টি হলে রাস্তায় জমা জল। তখন চার বেহারার কাঁধে চেপে ফেরা।

বাবা ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল জুড়ি গাড়ি। উনি তা দেখেননি চোখে। আট-দশ বছর বয়সে বড়দা ঋদ্ধিন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর বেচে দিয়েছিলেন বাবার গাড়ি। শিকার মডেলের মোটর ছিল। সেটায় হুটহাট চড়ে বসা যেত না। কোথাও গাড়ি নিয়ে বেরনোর ইচ্ছে হলে বাবাকে দিতে হতো কৈফিয়ত। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারলে, তবেই পাওয়া যেত গাড়ি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেরলেও বাবাকে না বুঝিয়ে উপায় ছিল না গাড়ি নেয়ার।

পল্টন দত্ত পড়ছিল।

হেঁটে স্কুলে যেতে হতো। সঙ্গে দারোয়ান। বড় বড বাড়ির অনেকেই আসত গাড়ি চেপে। ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সের কাঁটা খচ্-খচাত মনের তলায়। কিন্তু কর্তাদের মুখের ওপর কথা বলার সাহস ছিল না। বাবা পছন্দ করতেন না এই সব ফোতো বিলাসিতা।

ছোটবেলা থেকেই সুভো ঠাকুর দেখেছেন জোড়াসাঁকোর ছ নম্বর বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো। রান্নার জন্যে কুকিং গ্যাস। ওঁর বাবাই প্রথম ও বাড়িতে আনান ইলেকট্রিক আর গ্যাস। সারা বাড়ির উঠোনে গ্যাসের আলো জ্বালবার ব্যবস্থা ছিল। পরে এলো ইলেকট্রিক।

অতবড় বাড়িতে উৎসব বলতে মাঘোৎসব। ৭ই পৌষ কোনো রকমে নমো নমো করে পালন করতেন কর্তারা। ১১ই মাঘ ছিল ধুন্ধুমার উৎসবের দিন। পনের-কুড়ি দিন আগে থেকে উত্তেজনা। কিছু একটা আসছে, এরকম ব্যাপার। সারা উঠোন জুড়ে মাথার ওপর সামিয়ানা। ঠিক মাঝখানে বেদী। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বা ক্ষিতীন্দ্রনাথ আচার্য হিসেবে বসে উপদেশ দিতেন।

দু-তিন হাজার মানুষ আসতেন। বেশির ভাগই অব্রাহ্ম। টিকিট দেখিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা। টিকিট নিতে অবিশ্যি পয়সা লাগত না। সুভো ঠাকুর আর বাড়ির অন্যান্য অনেক ছেলে উৎসবের আগে টিকিট বিলিব ব্যাপারে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। বেশ একটা কেউকেটা মনে করতে হতো নিজেকে।

মাঘোৎসবের সময় নতুন জামা-কাপড় আসত ছ নম্বর বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্যে। ব্রাহ্ম বাড়িতে আর কোনো উৎসব নেই। দোলের সময় হিন্দুস্তানী দারোয়ানদের গায়ে-মুখে রং লাগাত খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা। উনি আর ওঁর ভাইও ভিড়ে যেতেন সে দলে। অসন্তুষ্ট হতেন মা-বাবা এই রং খেলা দেখে।

জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির চেহারা ছিল একেবারে অন্য-রকম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরের ভাই গিরীন্দ্রনাথের বংশধরেরা থাকতেন ওখানে। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেরা—অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র। ওঁরা হিন্দু। তার ফলে নিয়ম-টিয়ম অনেকটাই আলগা আলগা। ওখানে হিন্দুদের পুজো-উৎসব, বাইজি নাচ-গান সবই হতো। রবীন্দ্রনাথও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা ওই পাঁচ নম্বর বাড়িতে দেখতে গেছেন বাই-নাচ। লক্ষ্ণৌ থেকে আসতেন সব নামকরা বাইজি। মহর্ষি অবশ্য এসব ব্যাপার একে-বারেই পছন্দ করতেন না। দারুণ গোঁড়া ছিলেন তিনি। ধর্মের ব্যাপারে তো বটেই, এমন কি ব্রাহ্মণ কায়স্থ এসব নিয়েও তাঁর সঙ্কোচ ছিল। কেশব সেনের সঙ্গে মতবিরোধের ঘটনা তো প্রায় সকলেরই জানা।

পাঁচ নম্বর বাড়ির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল বেশি। কলকাতায় এসে ছ নম্বরে থাকলেও তাঁর কাছে বারবার আসতেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। সে কথায় পরে আসা যাবে।

নিজের এই বাড়ির চারপাশ নিয়ে কি ভেবেছেন সুভো ঠাকুর, তা পাওয়া যাবে তাঁর 'নীলরক্ত লাল হয়ে গেছে'র প্রথম চ্যাপ্টার উল্টোলেই।

পল্টন দত্ত পড়ছে, 'জন্মানোটার উপর আমার হাত ছিল না···

'হাত থাকলে, যে বংশে আমার জন্ম, সে বংশে যাতে না জন্মাতে হয় তার জন্যে যেমন করে হোক বিধাতার প্রিভি কাউন্সিলে পিটিশন পেশ করতেম, সবার সেরা ব্যারিস্টার মারফত।

'চেতনার চৈত্যবিহার যেদিন প্রথম তার অবরুদ্ধ দরওয়াজার আগল উন্মোচন করল, চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলুম পৃথিবীকে—সে পৃথিবী ছিল না এই, তার আস্বাদ ছিল অস্বাভাবিক, অন্যরকম। তার অঙ্গে ছিল না অন্য কোন গ্রহের আঘ্রাণ!

'যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথমতম পরিচয় পাতানো, যার বুকে হামাগুঁড়ি দেওয়ার পব পায়ে ভয় দিয়ে দাঁড়াবাব কৌশলে একদা পাঁয়তাড়া কবেছিলুম···সেখানকার মানুষরা ছিল না এই মানুষ, সেখানকার পরিবেশেব স্পর্শে ছিল যেন অন্য আর এক অনুভূতি।

'যে জগৎ ছিল অদ্ভুত, আরো অদ্ভুত সেখানকার জীবেরা। বাইরের আলো সেখানে প্রবেশেব পথ পেতে হ'ত দিশেহারা, মুখর জনতার জীবন্ত কোলাহল কৌতূহলবশত সেখানে উঁকি মারতে গিয়ে ঘটাতো নিজেদের পরম পরিসমাপ্তি। সেখানকার লোকেরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ-এর উপদেশ অনুযায়ী চলত গুনে গুনে পা ফেলে, বেদান্তের দৃষ্টান্তে হাসতো, আর কালিদাসের কবিতার কায়দায় কওয়াকওয়ি করতো কথা। আলাপ-আলোচনার অনেকখানি হতো ইশারায়—মূক অভিনয়ের আঙ্গিকে। খালি বাহির বিশ্বের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাণী প্রেরণ করে রাখা হতো যোগাযোগ।

'যেখানকার লোকেদের কারো চেহারায় য়্যাসিরিও ইঙ্গিতে ইজিপ্‌সিও ম্যামির ভঙ্গিমা, কেউ বা তিব্বতীয় অঙ্গরাখায় মোগল আমলের আলখাল্লায় আবৃত করত সর্বাঙ্গ। চিবিয়ে চিবিয়ে টিপ্পনি কাটত তারা চৈনিক কায়দায়, আর তুর্কিস্থানের অনুজ্ঞায় করা হতো তার টিকা, লস্ট হোরাইজনের একটা টুকরো কালের

কোন অজানা ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খেতে খেতে হাজির হয়েছিল এখানে—এখানকার মানুষ তারা কেমন করে হবে ?

'…থামের থুতনিতে থাম, বারান্দার বুকে বারান্দা, আঙিনার অঙ্গে আঙিনা, দালানের দেহে দালান, এ-ওর সঙ্গে জড়াজড়ি কোরে জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সে রাজ্য যেন 'ডাডাইজ্‌ম্‌' মার্কা দারুণ একখানা পট।

—'সে সব কি এখনকার ?

'না না তারা এখনকার নয়, এখানকারও নয়।

'সেই ঘুরে ঘুরে সাড়ে পাঁচতলা থেকে থেকে নিচে নেমে যাওয়া ইস্ক্রুপের মত ঘোরানো সিঁড়ি যেন কোন পাতালপুরীর অন্তঃপুর ভেদ করে অজানা রহস্যলোকের উদ্দেশ্যে আরো আরো এগিয়ে গেছে—সৃষ্টির আদিম অন্ধকার যার আনাচে-কানাচে থাকত ওত পেতে…

'—সূর্যের আলো ?

'অগুন্তি জানালা আর আর ঝিলমিলির অজানা রন্ধ্রপথ গলে হয়তো অকস্মাৎ তার দু-একটা ভাঙাচোরা টুকরো ভেঙে যাওয়া ঝড়ের ঠুনকো কাঁচের ঝালরের মত এদিক-ওদিক থাকত পড়ে অদ্ভুত ইশারা নিয়ে।

'থমথমে রাতে সিং-দরওয়াজার এপারে দালানের অতিকায় তিমির মত ঘুমিয়ে থাকা সিমেন্টের সিঁড়িগুলোর মসৃণ গায়ে তির্যক বেখার ভঙ্গিতে থমকে থাকত চাঁদের চোরা আলো।

'—ও, কত উঁচুনিচু ছাদের অলিন্দ এড়াতে হত ঐ চাঁদের আলোর সেখানে পৌঁছতে, কত উঠোন, কত রেলিং—কত পাঁচিল !

'নিশুতি রাত্তিরে একা একা অকারণ তারই আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম আমি, ভাবতুম অজানা রাজ্যের অজস্র ভাবনা, অনুভব করতুম সব অদৃশ্য মানুষের অশ্রুতপূর্ব মিছিলের যেন কোন এগিয়ে আসা পদধ্বনি।

'আচ্ছা সে আমি কী এই আমি, সে চাঁদের আলো কী ছিল এই

চাঁদের আলো ?

পল্টন দত্ত পড়ে যাচ্ছে, '—না-না সে চত্বরা, যে ছোটো বড় চত্তর, যে ছাদ আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মুঠোয় ধরতে পারা একটুখানি আকাশ—সেসবকখনই এখনকার নয়।

'তা নইলে কোথায় গেল তারা তলিয়ে ?...আলাদিনের আশ্চর্য আলোর মত কোথায় গেল সব উবে ? শুধু কাহিনী তার আরব্য উপন্যাসের টুকরো পাতার মত রয়েছে যেন পড়ে।

'জনাকীর্ণ শহরের জনতাবহুল বিস্তৃত রাজপথ। চলেছে সেখানে সাধারণ সব মানুষেরা, নগণ্য নানা মানুষেরা। ব্যস্ততায় ব্যাকুল অতি সাধারণ দৈনন্দিন দুনিয়া।

'সেই দৈনন্দিন দুনিয়ার মাথার মধ্যিখান হতে হঠাৎ সরু সিঁথির মত একটি গলিপথ এসে যেন প্রণত হয়েছে এখানকার প্রথম প্রবেশ-পথ দ্বারের পায়।

'এই প্রথম দ্বার পথ সারা বছরটি থাকত খোলা, একমাত্র উৎসবে কিম্বা ওমনিতর কোনো আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে কদাচিৎ বন্ধ করা হতো—সাধারণ মানুষের অত্যধিক ঔৎসুক্যের অত্যাচার আটকাবার নিষ্ফল আগ্রহে।

'এ বাড়ির যিনি প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, চপলা লক্ষ্মীকে বাণিজ্যের বিপুল বাহুর বজ্রবন্ধনে বন্দিনী করেছিলেন তিনি। দেশ-দেশান্তরের কত রাজা, কত রানী, কত গুণীজ্ঞানীর সাদর সম্মানিত উপহারসম্ভার সপ্তসিন্ধু পার হতে নিয়ে এসে হাজির করেছিলেন তিনি এ দেশে। লক্ষ্মীর লক্ষহীরার জয়মাল্য তাঁর কণ্ঠে দুলেছিল। পূর্ব পুরুষের অর্জিত আভিজাত্যের নীলরক্ত তাঁর নিজস্ব সমৃদ্ধির সমারোহে হয়েছিল ঘনীভূত—গাঢ় হতে গাঢ়তর। প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রয়োগের সঙ্গে আর্থিক প্রাচুর্যের পৃষ্ঠ-পোষকতায় তখনকার অভিজাত সমাজের শ্রেষ্ঠতম সিংহাসন অত্যন্ত সহজে সুযোগ পেয়েছিলেন তাই করায়ত্ত করার।

'তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পুত্র স্থূল অর্থের

প্রতি একান্ত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের সঙ্গে সঙ্গে—একমাত্র পরমার্থের চিন্তায় প্রয়োগ করলেন সব কিছু। নতুন ভাবধারায় নব-চেতনায় দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করার দুরূহ বোঝা বহন করে শিক্ষিত সাধারণের আত্মিক অন্তরের ঐকান্তিক পূজার সাথে সমাদৃত হয়েছিলেন তিনি মহর্ষিরূপে। সমাজ সংসার তুচ্ছ করে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, জীবনের শেষ দিনটি অবধি তাঁরই সুপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে দান করেছিলেন নিজেকে।

'প্রতিভার প্রাণময় প্রতীক তারই তো পুত্র-কাব্যলোকের নব সূর্য উদিত হলেন বিশ্বাকাশে। এই মনীষীকে পৃথিবী স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল নতমস্তকে। সার্বজনীন কাব্যজগতের জগদ্‌গুরুর গৌরব দান করে ধন্য হলো দেশ।

এতেই হলো না শেষ, এততেও হলো না ক্ষান্তি। রূপ-রাজ্যে আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় এর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র যখন আয়োজন শুরু করেছেন রাজসূয় যজ্ঞের—তারপর যজ্ঞ শেষে নিজের জয়ের বৈজয়ন্তী বাঁধলেন তিনি ভারতের কলার রথ-শীর্ষে। শিল্পাচার্যের এতকালের শূন্য আসনে সবাই পরমাগ্রহে অধিষ্ঠিত করলেন এঁকে—একান্ত আদর ও সম্মানে।

'এমনিধারা বংশপরম্পরায় কৃষ্টিগত আভিজাত্য আর আর্থিক সর্বশ্রেষ্ঠ কৌলিন্যের অলকানন্দার মতো বিস্ময়কর নীলরক্ত ধারার মাঝ থেকে অকস্মাৎ একদা আমার অভ্যুদয়···

'কিন্তু এ ছন্দপতন হলো কেন?···একথা বহুবার আমি বুঝতে চেয়েছি, মহাক্রোশে বিধাতার বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি—কেন, কেন তিনি আমার সাধারণ জীবনের অতি সাধারণ শান্তি হরণ করলেন, এমনিধারা আভিজাত্যের অষ্টপ্রহর আচার ও আইন মেনে চলার অতিষ্ঠকর পথে নিক্ষেপ করে—

'এই সব অগণিত অসাধারণদের আসা-যাওয়ার অস্বাভাবিক অদ্ভুত বক্রপথে আমি ছিটকে এসে পড়লুম নিয়তির নিতান্তই

একটা পরিহাস-উচ্ছল হ্যাঁচকা টানে—যেন হোঁচট খেয়ে। কতদিন ভগবানের কাছে কর্ণ মিনতির সঙ্গে আবেদন করেছি, হে ভগবান, আমায় বাঁচাও—এদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর। আমি বাঁচতে চাই. অতি সাধারণদের মতো তাদের সব দোষ দ্র্বলতা নিয়ে আমি সহজভাবে বাঁচতে চাই, অজস্র জনতাময় জগতের মধ্যে অতি নগণ্য নিতান্ত সাধারণ একজন হতে চাই—এ বাড়ির 'দেবশিশ্ন' হওয়ার একান্তই অযোগ্য আমি।

'নাই বা রইলেম আমি প্রাসাদে, হলেমই না হয় হতদরিদ্র। পৈত্রিক স্ত্রে প্রাসাদের পরিবর্তে পেলেমই না হয় এক পর্ণ কুটির। হতো না হয় সামান্য উপজীবিকা—কেরানির। শান্তি আর পরি-প্র্ণতায় উচ্ছল হতো তো দিনগ্নলো জীবনের।

'ভাগ্য অত সহজেই যদি ভোল ফেরাত তাহলে তো কথাই ছিল না। শৈশবকাল থেকেই চলল বংশের রীতি অন্যায়ী অসাধাবণ তৈরি করার সাংঘাতিক প্রচেষ্টা। মহা মহা উচ্চাদর্শের অসংখ্য ইন্‌জেক্‌শানে শৈশব জীবন হলো জর্জরিত, তারপর তুচ্ছ সাধারণের কাছ থেকে তফাত রাখতে আরম্ভ হলো সে কী বাধা-নিষেধের অমান্ষিক অত্যাচার। দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের অচ্ছ্বৎদের থেকে আড়ম্বরবহ্বল নিজেদের তফাত রাখার বিশিষ্টতাও বোধহয় হার মানে তার কাছে।

'চারতলায় খান দশ-বারো ঘরে আমার জীবন হলো বন্দীবন্ধ, আর বাহিরের জগৎ সাড়ে পাঁচতলার ছাদের শেষ সিঁড়ির ধাপের সাথেই হলো শেষ। কারণ পরিচারক সঙ্গে নিয়ে সেই ছাদেই আমরা বিকেল হলে বেড়াতে বেরবার জন্যে সাজগোজ সমাপ্ত করে তৈরি হতাম নিত্য।

'বেশ মনে আছে, সেই বয়েস হতেই বাড়ির প্র্ষান্ক্রমিক প্রথা অন্যায়ী অনন্য-সাধারণ তৈরি করবার জন্যে আমার জীবনকে যে শিক্ষার উপর বিস্তৃত করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা ভীষ্মের শরশয্যাকেও অতি সহজে করতে পারত শয্যাশায়ী।

'শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, অরুণোদ্গমের আগেই নিয়মিত বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য হতেম, নতুবা স্মেলিং সল্টের তীব্র ঝাঁকুনি ঘুমন্ত শিরা-উপশিরায় আচমকা জাগরণের নিষ্ঠুর চাবুকের মত পড়তো অতি নিমর্মভাবে, তারপর শীতল জলে স্নান সমাপন শেষে একটা ঘণ্টা কবতে হ'ত উপনিষৎ পাঠরূপ ভগবৎ-ভজনা, তারপর ব্যায়াম চর্চা অন্তে আরম্ভ হ'ত শিক্ষকের মারফত অধ্যয়নের আয়োজন—শিল্প শিক্ষক, সঙ্গীত শিক্ষক, এমনিধারা সংখ্যাহীন শৃঙ্খলিত শিক্ষকদের শিক্ষায় সময়গুলো সর্বদাই সজারুর শরীরের মতই থাকত সাংঘাতিক রকম কণ্টকাকীর্ণ। তারি ফাঁকে বিকেলটুকু ছিল ছুটি—যেন বর্ষার ফাঁকে এক ঝলক বৌদ্রালোকের মত মনের আকাশে তা করতো ঝলমল! অট্টালিকায় অতিষ্ঠ শহরের ছোটো এতোটুকু ফাঁকা পার্কের মতই সেই বিকেলটুকু ছিলমাত্র রুটিনের মরুভূমির মধ্যে অতুলনীয় ওয়েসিসের মত…

'ছাতে, ইমারতী বেলিংগুলোর মাঝে মাঝে রামায়ণের পয়ারী ছন্দের মিলমাফিক যে বামনের মত নিচু নিচু থামগুলো থাকত উঁচু হয়ে, গরমকালে তার মাথায় রাখা বেলিফুলের টবগুলোয় স্তবকে স্তবকে ফুটে থাকত অগুন্তি ফুল—যেন সাদা আগুনের তুবড়ি থেকে ফেটে বেরনো অসংখ্য ফুল্‌কি।

'পরিচারকের সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টিকে দুয়ো দিয়ে বেলিফুলের কোনো টবের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই সাড়ে পাঁচতলার ছাতের রেলিং-এর থেকে কোন এক ফাঁকে কোমর অব্দি দিতেম এগিয়ে, তারপর ঝুঁকি মেরে এক দৃষ্টিতে দেখা চলতো খেলা ঃ একতলার উঠোনে ছোটো ছোটো আমারই সমবয়সী ছেলেরা সব খেলছে, তারা কেউ বা ভজহরি চাকরের ছেলে, কেউ বা আবার ছট্টুলাল দরওয়ানের নাতি। কত কি খেলা ওরা খেলে চলেছে—কত, কতক্ষণ ধরে।

'আচ্ছা, ওদের তো গান শেখাবার জন্য ওস্তাদজী আসার

আবশ্যক হয় না, দোলের দিনে না শিখেই তো ওরা কেমন গান গায়। অংকের মাস্টার ওদের বেলা তো কৈ অংক শেখাতে আসে না, আর ওরাও মাস্টারের কাছে কিছু না শিখেও তো লাট্টু কেনার বাকি পয়সার কি সুন্দর হিসেব মিলিয়ে ফেরত দেয়।

'ভাবতুম, কি চমৎকার ওদের জীবন। কামনা করতুম ঃ ভূমিকম্পে কেন এই দালানটার থামগুলো ভূমিসাৎ হয় না? কিংবা সারা বাড়িটা যদি চেপ্টে নিচের উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়তো— এখুনি হয়ে যেতো সব একাকার, বাঁচা যেতো।

'নির্বিবাদে কেমন খেলা যেতো ঐ সব ছেলেদের সঙ্গে।

'ভজু চাকরের ছেলে কিংবা ছট্টুলালের নাতির সঙ্গে খেলা তো দূরের কথা, আমাদের বাড়ির পিছন দিকে বারাণসী ঘোষের গলির ঐ ধারে যাদের বাড়ি—তাদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে ছাদ থেকে একবার কথা বলেছিলাম, তার জন্যে হাত পেতে নিতে হয়েছিল বেত্রদণ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ-সহ এ কথাও শুনেছিলাম ঃ এ বাড়ির ছেলেরা পাড়ার যার-তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে না— নিয়ম নয়।

'…শৈশবের শেষে কৈশোরের কোলে এসে পেঁছেছি। এমনিধারা পারিপার্শ্বিকতা আর পরিবেশের প্রচণ্ড প্রতাপে মতলবে ধরতে বাধ্য হোয়েছে অকালপক্কতার পাক। স্কুলে আর সকলের মতো পড়াশুনো না কোরে হোমটাস্কের খাতায় ছড়াকাটা শুরু করেছি, প্রমোশন না পেয়েও সগৌরবে চলেছি বুক বাছিয়ে।

'সেই বয়সে গ্রন্থকার হওয়ার দাবিতে সাধারণ সহপাঠীদের প্রতি দাক্ষিণ্য মেশানো অসীম তাচ্ছিল্য প্রকাশে পুরোপুরি পোক্ত হয়ে উঠেছি তখন। দৈনিক 'শায়ক'-এর সম্পাদক এক কলমের উপর এক আর্টিকেল লিখলেন আমার একটা ছবির উপর—এতে পড়ল ঘৃতাহুতি। পুরুষানুক্রমিক প্রথা অনুযায়ী ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি আর পায়জামার সঙ্গে লম্বা চুলও রাখতে শুরু করেছি। সহপাঠী কেউ বাড়িতে এলে, মাঝে মাঝে বড়দের মত আল্লাখাল্লা

পরে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে স্তম্ভিত করে দিয়েছি অনেকবার।

'তখন পিতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটেছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে পূর্বপুরুষের অর্জিত জমিদারিব জমিদারি করার ভার আমার ঘাড়ে পড়তে বাধ্য হলো। তুচ্ছ অর্থের প্রতি অসামান্য তাচ্ছিল্যে, আর অপব্যয়ের অসাধারণ বাহুল্যে বংশপরম্পরায় চলে আসা জমিদারি আমার হাতে পড়ে যখন বানচাল হবার উপক্রম করেছে, তখন হঠাৎ একদিন ঠিক করলেম এই অতি সাধারণ দেশে আর থাকব না।

'ফিরব না বলেই দেশ ছেড়েছিলাম, কিন্তু একদা এই অতি সাধারণ দেশেই আবার যখন ফিরে আসতে বাধ্য হলাম—তখন দেখলাম এক অসাধাবণ দৃশ্য! যে জগতে আমি জন্মেছিলাম, যে জগতে এত বছর একনাগাড়ে বেড়ে উঠেছি, যে জগৎ দেশের বুকে এত পুরুষ ধরে আভিজাত্যে একাধিপত্য করে এসেছে—সেই নীল শোণিতের সুবর্ণরেখায় মাথা উঁচু করেছে প্রকাণ্ড একটি চড়া।

'লোহার ফটকে পড়েছে মরচে, খালি পড়ে থাকা সংখ্যাহীন গোলকধাঁধার মত ঘরগুলো ভাড়া দেওয়ার চলেছে আলোচনা। বিরাট আস্তাবলখানার অশ্বশালা রিকশা রাখার ভাড়াটে গ্যারাজে হয়েছে পরিণত। দেখলুম দুর্গের মত বাড়ির দধিচীর হাড়ের তৈবি বনিয়াদি বসতে শুরু করেছে। থামগুলোয় ধরেছে বড় বড় ফাটল, ছাদগুলোর ছ্যাদ্লা জমে বর্ষাকালে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে জল।

'বেদনার চেয়ে আনন্দ পেলাম বেশি, বিশ্বাস হলো ভগবানের অস্তিত্বে, বুঝলাম বহুৎ দূরে অধিষ্ঠিত হওয়ায় প্রার্থনাগুলো তাঁর কাছে পেঁছতেই লাগে সময়, তাই ফল প্রায় পাওয়া যায় অসময়েই। বুঝলাম শৈশবের প্রার্থনা যৌবনে পেল পরিপূর্ণতা।

'মর্যাদাময়ী সে বংশের যেটুকু বাকি ছিল অর্থশাস্ত্রের শেষ অস্ত্রাঘাতে তাও পড়তে বাধ্য হলো একদিন ধসে—চোখের সামনেই দেখলাম এক এক করে আভিজাত্যের উচ্চ শির থামগুলো গুঁড়ো হয়ে গেল। সম্মানের যে সৌধ এত পুরুষ ধরে রচিত হয়েছিল তার একটা তলা চুরমার হয়ে পড়লো ছত্রাকার হয়ে। ভাঙা ইট-পাটকেলের প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত সেই ভেঙে যাওয়া আভিজাত্য, অহংকার গৌরব সব কিছু মিলে পাহাড়পুরের মতই তৈরি করল একটা বিরাট ধ্বংসাবশেষ। অতীতের সাক্ষীর মত তারি কোণে কোণে দু-একটা জীর্ণ ঘর উঁকিঝুঁকি মারছে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের এলোমেলো প্রশ্নের আলগা উত্তর দেবার অপেক্ষাময় অপেক্ষায়।

'ভজু চাকরের ছেলে যদি আজ বেঁচে থাকতো আর ছটুলালের সেই নাতি—দেখতো তাদের দাদাবাবুর সঙ্গে খেলা করার সকল বাধার হয়েছে অবসান।

'জোড়াসাঁকোর সাড়ে পাঁচ তলার ছাদ থেকে আমি তখন নির্বিবাদে নেমে এসেছি নিচে, পঁচিশ টাকা ভাড়ার ভবানীপুরে ইঁদুরের আবাসেরও অধম অতি সামান্য এক ব্যারাকবাড়িতে।

'কিন্তু কি আরাম, বন্ধুদের চায়ের আড্ডার সময় অসময়ে হাজির হতে বিন্দুমাত্র বাধা ঠেকে না, কেউ এলে, তিব্বতী আল-খাল্লায়, তেহেরানের চাদর চড়িয়ে দেখা করতে আসার হাঙ্গামা নেই। তোরণের পর তোরণদ্বার, আর দ্বারীর পর দ্বারীর দাক্ষিণাত্যের ওপর নির্ভর করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা বন্ধু-বান্ধবের সবসময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু সবার ওপর স্বর্গীয় আভিজাত্যের অসহনীয় একাকীত্বের মৃত্যুর মত তুহিন শীতল একঘেয়ে জীবনের থেকে পেয়েছি মুক্তি, সেই বিচিত্র উল্লাসময় জগতের স্বাভাবিক উৎসব আসার।

'লোকে বলে আমার কথার কায়দায় এককোণে কোথায় আজো নাকি সেই অতীত দিনের রোমাঞ্চময় রাজত্বের একটা স্পর্শ রয়ে গেছে, বাসি ফুলের ম্লান গন্ধের মত মেজাজ আজো মরেনি,

মোগলাই আমলের নবাবী দিল্। ভাবনায়, সেই অতীত দিনের ভুটানী উপকথার অবাস্তবতার একটা আমেজ।

'সন্ধ্যাবেলায়, ফাল্গুনের সন্ধ্যাবেলায় মেজেতে বসে মাসিক পরিক্রমার স্তূপাকার প্রুফের মধ্যে অকস্মাৎ উতলা হয়ে উঠলো মন—বেড়ে হাওয়া দিচ্ছে, কাছে-পিঠে অনুভব করলাম বেলি ফুলের টব সাজানো এতটুকু ছাতের একটা আবশ্যকতা, তা নৈলে, দক্ষিণের হাওয়া সেই আগের দিনের সাড়ে পাঁচতলার ছাদেও যেমন বইত এই পঁচিশ টাকার ব্যারাকবাড়িতেও তেমনি বইছে।

'প্রুফ দেখা রেখে দিয়ে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সদ্য আনা ইংরেজি পত্রিকাটি উল্টোতে গিয়ে ভারি ইন্টারেস্টিং একটা হেডিং চোখে পড়লো—জারের এক নিকট আত্মীয়া, প্যারিসের হোটেলে প্লেট সাফ করতে করতে য়্যামেরিকান মাল্‌টি মিলিওনিয়ারের সঙ্গে তার উদ্বাহের ইতিহাস, তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের বিচিত্র কাহিনী...

'নাঃ পড়া আর শেষ হলো না। ভাইপোর চিৎকার আর কান্নায় উঠ্‌তে হোলো, দেখি—আঙুলটা কেটে ওর রক্ত পড়ছে।

'কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করল: রাস্তার ওপারে 'মংটু' ধোপার ছেলে ওর ধরা ঘুড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে, সুতোর মাঞ্জায় আঙুলটা গিয়েছে কেটে। ভ্রাতুষ্পুত্রের কেটে যাওয়া আঙুল আইডিন দিয়ে বেঁধে দিতে গিয়ে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলুম: আভিজাত্যের নিবিড় নীল রক্ত আমার মধ্যে সহস্র চেষ্টাতেও যা মুছেও মুছল না—রক্তমুখী নীলার মত আজো রয়ে গেল যা বেগুনি রূপ ধারণ করে—ওর মধ্যে দেখলুম সে নীল রক্ত নিঃশেষে লাল হয়ে গেছে।

পল্টন দত্ত একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে আবার পড়তে লাগল—

'এই লাল রক্ত হতেই তো লেনিনের, স্টালিনের, গোর্কির উৎপত্তি—আরো আরো কত লোকের। সহস্র কোটি লোকের সাহচর্য আর সহানুভূতি ওর জন্যে জমায়েত হচ্ছে, ওর সৌভাগ্যে

আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পানে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার।'

'নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে'-র প্রথম চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে এভাবেই। পড়তে পড়তে আবিষ্কার করা যায় একজন মানুষকে, যিনি তাঁর চারপাশের সংস্কারের দেউড়ি আর ছদ্ম আবরণ ভেঙে করতে চেয়েছিলেন চুরমার। শুধু চান নি, করেও ছিলেন অনেকখানি, তাঁর আঁকায়, লেখায়, জীবন-যাপনে।

সিগারেটে একটা আলগা টান দিয়ে পল্টন বলল, বাঃ সুভোদা। তারপর পড়তে লাগল—

মধ্যাহ্নের রবি ও আমরা

'রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যখন ৬ নম্বর বাড়িতে আসতেন, তখন তাঁর ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে মেলামেশা ছিলো খুবই ফর্মাল। পেছিয়ে যেতে যেতে জানালেন, সুভো ঠাকুর, 'আমরা গিয়ে প্রণাম করলে বড়জোর মাথায় হাত দিয়ে কি কেমন আছিস ? কিংবা গাল ধরে সামান্য আদর।' পাঁচ নম্বর বাড়ির অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ রবিকাকা এলে বাধাতেন হৈ-চৈ। সে জায়গায় ৬ নম্বর বাড়ির ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে কেমন যেন সম্ভ্রমের সম্পর্ক।

'দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে সুধীন্দ্রনাথকে কখনও দেখিনি খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার সুধীন্দ্রনাথও যে রবীন্দ্রনাথ এলেই হাজির, তেমন নয়। এই সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন 'সাধনা'র সম্পাদক। পরবর্তীকালে সাধনার সম্পাদনা তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে।

'মনে পড়ে আমাদের বাড়িতে উনি এসেছিলেন একবারই। আমার এক পিসিমার গলায় অপারেশন হবে। উনি বললেন, রবিকাকা না বললে করাব না। তখনই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এছাড়া আমি তাঁকে তখনও দেখিনি আমাদের অথবা অন্যান্য কারুর ভিতর বাড়িতে আসতে।

'শুনেছি আমার বড় পিসিমা প্রতিভা দেবী, যিনি স্যর আশুতোষ চৌধুরীর স্ত্রী, তাঁকে আর আমার সেজো পিসিমা অভিজ্ঞা দেবীকে খুবই ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। স্যর আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই, রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ বন্ধু। আশুতোষ চৌধুরী পরে জজ হন ও নাইটহুড পান।

'অভিজ্ঞা দেবী সুভো ঠাকুরের জন্মের আগেই মারা যান। তিনি গাইতে পারতেন দারুণ। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েও অভিজ্ঞা দেবীকে স্মরণ করেছেন বারবার। প্রতিভা দেবী, 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় সেজেছিলেন সরস্বতী।

'ভাইপোদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ আর সুরেন্দ্রনাথ—এই দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিলো ভালো। এই সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরই রবীন্দ্রনাথের মুখাগ্নি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন ব্যবসা, একসঙ্গে। তা অবিশ্যি চলে নি বেশিদিন। এছাড়া বার্লিনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের কিছু কাছাকাছি এসেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী অমিতা ঠাকুরকেও ডেকে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ। সম্পর্কে উনি নাত-বৌ। অমিতা ঠাকুরকে 'মহিষী' বলতেন রবীন্দ্রনাথ। 'তপতী'তে মহিষীর অভিনয় করেছিলেন অমিতা ঠাকুর, সেজন্যেই এ নাম।

'রবীন্দ্রনাথের বড় বোন সৌদামিনী দেবীকে দেখেছেন সুভো ঠাকুর। তাঁকে ডাকতেন বড় দিদিমা বলে। ও'র স্বামী ছিলেন ঘরজামাই। সৌদামিনীর হাতে মিষ্ট খাওয়ার স্মৃতি মনে আছে এখনও। ৬ নম্বরের আদি অংশে থকেতেন সৌদামিনী।

রবীন্দ্রনাথের অন্য দুই বোন স্বর্ণকুমারী আর শরৎকুমারীকে

দেখেননি সুভো ঠাকুর। স্বর্ণকুমারীর অবস্থা ভালোই ছিলো। ও'র ছেলে স্যর জ্যোৎস্না ঘোষাল, আই সি এস, মেয়ে সরলা দেবী। বর্ণকুমারীর আর্থিক অবস্থা ছিলো খুব খারাপ। এন্টালীর ওদিকে মসজিদের সামনে একটা সস্তার ঘরে থাকতেন বর্ণকুমারী। ঠিকমতো মাসোহারা পেতেন না। অথচ বিলি-ব্যবস্থার ভার রবীন্দ্রনাথের ওপর। 'বর্ণ দিদিমা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন মাসোহারার টাকার জন্যে।' মসজিদের কাছে সে বাড়িতে গেছেন সুভো ঠাকুর। লুচি-আলুর দম প্রায়ই খাওয়াতেন বর্ণকুমারী।

'দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের। তবে তা শান্তিনিকেতন সূত্রে। দিনুদার বাবা দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যধিক সুরাসক্ত। তবুও ও'র প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিলো মহর্ষির। সুভো ঠাকুরের ঠাকুরদাদা, বাবা, জ্যাঠামশাই কেউ মদ সিগারেট পান পর্যন্ত খান নি। সুভোবাবু পনের ষোল বছর বয়েসেই প্রথম মদ খান। জমিদারি দেখতে গেলে নজর-সেলামির টাকা দিত প্রজারা। সেই পয়সার থাকত না হিসেব। আর কি, তখন ঢালাও ফুর্তিফার্তা।

'নিজের বছর তের বয়েসে মাসিক 'চতুরঙ্গ' বের করলেন সুভো ঠাকুর। সম্পাদক উনি এবং ও'র বাবা ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। টাকা-কড়ির যোগানদার বাবাই। স্কটিশে ফোর্থ ক্লাসে পড়েন সুভো ঠাকুর। তখন রবীন্দ্রনাথ মধ্যগগনে। নন্দলালের ছবি দিয়ে বিচিত্রায় বেরিয়েছে বিশাল কবিতা। ক্লাস ফ্রেন্ডরা বলল সুভো ঠাকুরকে, তোমার চতুরঙ্গে তোমার দাদু লিখছেন না কেন?

'ব্যস, শোনামাত্রই মাথায় নড়ে উঠল পোকা। সকাল নটা-দশটা হবে। সোজা হাজির রবীন্দ্রনাথের সামনে। উঠোন পেরলেই রবীন্দ্র-নাথের মহল। যাওয়া যায় ছাদ দিয়েও। গিয়ে দেখলেন সেক্রেটারিয়েট টেবিলে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। মেঝের ওপর কি যেন পাতা একটা, শতরঞ্জি অথবা কার্পেট। বোসে পড়লেন তার ওপর।

'রবীন্দ্রনাথ এত নিবিষ্ট যে ঘণ্টাখানেক কোনো কথাই নেই। প্রায় একঘণ্টা পরে সুভো ঠাকুর ওঁর নজরে।

'সোজা কথা, কাগজ করছি। লেখা দিন।

'একটু থমকালেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, আমার কি আর সেই বয়েস আছে! আমি আর কি লেখা দিতে পারি!

'গোটা ব্যাপারটাই খুব বাজে ছুতো মনে হয়েছিলো সুভো ঠাকুরের কাছে। তারপর হঠাৎই অটোগ্রাফের মতো চারটে লাইন দিলেন লিখে। তার দুটো লাইন মনে আছে এখনও—'বড় কাজ নিজে বহে আপনার ভার বড় দুখ নিয়ে আসে সান্ত্বনা তাহার—'। বাকি দু লাইন আর মনে নেই।

'চতুরঙ্গের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল চার লাইন। রিলিফ ওয়ার্কে রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন সুভো ঠাকুর। সেই প্রতিকৃতির ওপর পাতলা কাগজে মুদ্রিত চার লাইনের কবিতা। তারপর আর কখনও লেখার জন্যে যাননি রবীন্দ্রনাথের কাছে। ছিলো না কোনো যোগাযোগও।

'ছ মাস চলে 'চতুরঙ্গ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বের করেছে ভবিষ্যৎ। চলে দু বছর। তারপর 'অগ্রগতি'। পত্রিকা পরিকল্পনায় সুভো ঠাকুর। সম্পাদক আশু চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনার অনেকখানিই দেখতেন বিরাম মুখোপাধ্যায়। 'অগ্রগতি'তে শান্তিনিকেতন নিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্য হয়েছিল ছাপা।

'বাবা ঋতেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের কি প্রতিক্রিয়া জানতে পারেননি সুভো ঠাকুর। কোনো লিখিত শোকবার্তা আসেনি বিশ্বকবির কাছ থেকে।

'নিজের আঁকা বা লেখার ওপর বাড়ির কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না। পরোক্ষ প্রভাব হয়ত ছিল কিছু। প্রথমে লিখতে আঁকতে এসে শুধু উপহাসই শুনতে হয়েছে। আর যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁদের জন্যে গাদা গাদা প্রশস্তি। প্রতিকূলতা পদে পদে,

একমাত্র ও'র পিতৃদেবই এ ব্যাপারে ছিলেন সহানুভূতিশীল। বারো বছর বয়সে বেরয় ও'র প্রথম বই, 'মঞ্জুরী'।

'কিশোরদের গল্প সংকলন। ভূমিকা অমৃতলাল বসুর।

মা-কে সেভাবে কাছে পাওয়া যায়নি কোনোদিন-ই। যেন দূরের আকাশ, অনেক দূরের নদী। আছেন এই পর্যন্ত। 'মা আমাদের কখনও কাপড়-জামা পরিয়ে দিচ্ছেন, বই নিয়ে পড়াতে বসেছেন—এমনটি হয়নি।' এ আক্ষেপের সুর সুভো ঠাকুরের গলাতে আজও।

'হয়েছে বরং উল্টোটাই। জন্মদিনে দিদিমার কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত। তা থেকে আবার পড়ে শুনিয়েছেন মাকে।

'নিজের ঠাকুরদা হেমেন্দ্রনাথকে দেখেন নি। দ্বিজেদ্র, সত্যেদ্র, জ্যোতিরিন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ—দেখেছেন এই ক'জন ঠাকুরদাদার ভাইকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বেশির ভাগ সময়টাই থাকতেন শান্তি-নিকেতনে। এখনও মনে আছে অসুস্থ হয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

লেখাটি পড়তে পড়তে মজে যাচ্ছিল পল্টন।

'সত্যেন্দ্রনাথ জজ হয়ে আসার পর থাকতেন স্টোর রোডের বাড়িতে। এখন যে বাড়ি বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম। রাস্তার নামও পাল্টে গিয়ে গুরুসদয় রোড। রাঁচি থেকে অসুস্থ হয়ে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। কিছুদিন থাকলেন সরোজিনী দেবীর কাছে। ইনি সুভো ঠাকুরের বড় জ্যাঠাইমা। হিতেন্দ্রনাথের স্ত্রী।

স্মৃতির রেখায় স্পষ্ট জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখ। শরীর। ওই তো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্কেচ করছেন। বিষয় মানুষের খুলি। সঙ্গে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এভাবেই সামনে ভেসে ওঠে অনেক কিছু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুভগেন্দ্রনাথের কোনো স্কেচ এঁকেছিলেন কিনা, এখন সে কথা মনে নেই।

প্রবাসী দাদামশাইদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হননি বাবা কিংবা জ্যাঠামশাই। পরিচয়ও করিয়ে দেননি তাঁরা। এসব আলাপ করানোর মূলে চিত্রা, সুধীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে। ওই বোলত, 'ইনি বড় দাদামশাই'। 'উনি নতুন দাদামশাই—জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর।'

সুভো ঠাকুর এবং…

'জন্ম তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৯১২। বাংলা হিসেবে ১৮ পৌষ ১৩১৮। জোড়াসাঁকোয়। এ নিয়ে তাঁর বোধহয় শেষ নেই আক্ষেপের। 'নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে'-র প্রথম চ্যাপ্টারের প্রথম লাইনেই ধ্বনিত এর প্রতিধ্বনি—জন্মানোটার ওপর আমার হাত ছিল না…

ছাব্বিশ বছরে ছেড়েছেন ছ' নম্বর বাড়ি। তারপর যত্রতত্র।

'পোয়েট টেগোর হন কে তোমার
জোড়াসাঁকোতেই থাক।
বাবার খুড়া যে হন শুনিয়াছি, মোর
কেহ হয় নাক…
ক্ষমা কোরো আর, জোড়াসাঁকোতেই
রয়েছে যদিও অংশ
পায়রার খোপ্ বহুদিন ত্যাজি
উড়েছি হইয়া হংস' (প্যানসি ও পিকো)

'এমন সব লাইন লিখেছেন বুক ঠুকে। থমকাননি একটুও। যথার্থ অর্থে বোহেমিয়ান ও রোমান্টিক। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের উল্টোদিকে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকদের বাড়ি। আসলে ওটা অনেক আগে ছিলো নাকি দ্বরকানাথ ঠাকুরেরই। সেখান থেকে স্যামুয়েল ফিট্জ-এর ওপরের ফ্ল্যাট। তারপর তালতলায় ছুতোর মিস্তিরিদের কারখানায়।

ওফ, সুভোদা পারেও—পড়তে পড়তে আপন মনে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে একবার কেশে নিয়ে বলল পল্টন। তারপর আবার পড়তে লাগল—

'কে সি দাশ-এর মিষ্টির দোকানের মালিক সারদা দাশের বাগবাজারের বাড়ি অতিথি হিসেবে ওঠেন ছুতোর মিস্তিরিদের ডেরা থেকে। সারদাবাবু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই সুভো ঠাকুরের বেঁচে থাকা আর ছবি আঁকার ব্যাপারে ছিলেন উৎসাহী। সক্রিয় সহযোগীও। অনেক সাহায্য করেছেন ওঁরা।

সমস্ত দুনিয়া জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব। ফ্যাজিসম তার দাঁত শিঙ নখ নিয়ে ভীষণ চেহারায় হাজির। চীনা কবি ও শিল্পীদের সাহায্যের জন্যে এই সময় নিজের ছবির প্রদর্শনী করেন সুভো ঠাকুর। হিন্দুস্তান বিল্ডিংয়ের পাশের গলিতে, চুংই থং চার্চ স্কুলে। রং তুলি ছবি আঁকার সরঞ্জাম সব কিছুই যুগিয়েছিলেন সারদা দাশ। অনেক ছবিই আঁকা হয়েছিলো ছুতোর মিস্তিরিদের আস্তায়।

'প্রদর্শনীতে ঝুলেছিল সুভো ঠাকুরের পেইনটিং। ক্যাটালগ বিক্রি করা যাবতীয় টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাদাম চিয়াং কাইশেককে। চীনা কবি শিল্পীদের সাহায্যে।

'এগজিবিশন শেষ হয়ে গেল। ট্রামে দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। তিনি বললেন, বেড়িয়ে এলুম কাশ্মীর। কি দারুণ জায়গা।

'ব্যস, মাথার মধ্যে নাচ বোহেমিয়ান ভূতের, যেতে হবে কাশ্মীর।

'যা ভাবা, তাই কাজ। লিখে ফেললেন এক চিঠি কাশ্মীরের আর্ট স্কুলের বাঙালি প্রিন্সিপালকে। একটা চাকরি চাই।

'চিঠির জবাব এলো টেলিগ্রামে, চাকরি ঠিক হয়েছে। চলে আসুন।

'যাওয়ার ভাড়া নেই। কে দেবে টাকা! এগিয়ে এলেন স্নেহাংশু আচার্য। দিয়ে দিলেন গাড়িভাড়া। সেই পয়সায় কাশ্মীর।

স্নেহাংশু আচার্য টাকা না দিলে যাওয়াই হতো না কাশ্মীর। আলাপও হতো না বংশী চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে। সে কথা পরে।

'স্মৃতি কি শুধুই জলের রেখা? হঠাৎ উড়ে আসা চন্দনের ঘ্রাণ? না কি মোজাইক করা দরবার কক্ষ, পাথরের ফলক? সুভো ঠাকুর কেমন করে আগলে আছেন এত কথা? এত বিস্মরণ?

'নতুন কবিতার বই 'অতন্দ্র আলতামিরা'র লাইনে লাইনে সেই পুরনো আমিটি হেঁটেছে চিরনতুন আমিটির পাশাপাশি। সেই পুরনো থাম, বড় বড় সিং-দরজা, বাবু কলকাতা, ল্যান্ডো ব্রুহাম বার বার উঠে এসেছে ছাপা চলা এ বইয়ের কবিতায় কবিতায়। 'নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে'-র এক জায়গায় লিখেছিলেন সুভো ঠাকুর,'—হ্যাঁ,সেই কথাই তো আমিও বলি—সেই একতা, আলাদা হলে পর হবার সম্ভাবনা আছে, যাতে এক সম্মিলিত ঐকতানে আমরা সবাই বাঁধা পড়বো, যেমন হয়েছে রাশিয়ায়। ইউ এস এস আর-এ ভুক্ত হয়ে আছে কত দেশ, তাদের প্রত্যেকের কত বিভিন্ন কৃষ্টি, তাদের প্রত্যেকের কত বিভিন্ন ধর্ম, কত বিভিন্ন জাত—কিন্তু সব তারা এক—ভাবিকালের সেই ধর্ম আমাদের দেশে একমাত্র কাম্য—যার নাম কম্যুনিজম্। আর সেই কম্যুনিজম্। আর সেই কম্যুনিজম্ আমাদের এই অন্ধকার দেশে একমাত্র আশার আলো। যাতে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আহমস্তান, অন্ধ্রস্তান সব মিলে এক হতে পারে।

'টুটুলের স্তব্ধ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল আনন্দে, ওর মনের মানসলোকে যে মহামন্ত্রের ধ্যানের জন্যে ও তৈরি হতে চায় তাতে শেঠ সাহেবের এমনি অজানিত সায় পেয়ে ও উপচে উঠল এবার।

'কিস্তোয়ার পথে যেতে মনের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ লাল ফুল দেখতে পেয়ে ও অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল, আজ অনুভব করল তার সুস্পষ্ট সৌরভ।

'সাম্যবাদ হচ্ছে একমাত্র ধর্ম', যার কোলে সত্যি তাহলে মানুষ

দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা, কৃষ্টি, সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিভেদ ভুলে আশ্রয় নিতে পারবে।'

'ঠিক এই মুহূর্তে' দাঁড়িয়ে সুভো ঠাকুরের স্পষ্ট উচ্চারণ—'আমি কমিউনিস্টও নই, ক্যাপিটালিস্টও নই। আমি আর্টিস্ট। জন্ম রোমান্টিক ও বোহেমিয়ান। আর সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের প্রতি যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সমর্থন, তা ওই রোমান্টিকতা থেকেই।'

'কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই কখনো কোনো যোগাযোগ রাখেন নি। তবে চেষ্টা করেছেন পেঁছুতে মানুষের গভীরে। যখন চুটিয়ে আঁকছেন লিখছেন, তখন ওঁর বেশির ভাগ বন্ধুই ছিলেন কমিউনিস্ট। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন অনেক সহানুভূতি, সহযোগিতা।

'স্মৃতির জরিতে বোনা ঘটনার পুরনো বালুচরি মেলে ধরলেন সুভো ঠাকুর। ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মার কাছে শিখেছিলেন ছবি আঁকা। অয়েল পেইনটিং শিখিয়েছেন চারুবাবু। তিব্বতী ব্যানার পেইনটিং শিখেছেন বেকারাজের কাছে। অবনীন্দ্রনাথও শিখেছিলেন বেকারাজের কাছেই। অনেক পরে ওঁর ছবি হয়ে উঠেছে ওঁর-ই মতো। অক্লান্ত চেষ্টায় পেয়েছে। নিজস্ব চেহারা। তবে এর পেছনে নিশ্চয়ই আছে এত সব গুণিজনের অক্লান্ত চেষ্টা।

'পঞ্চাশ/ষাটটা বড় ছবি এঁকেছেন। বেশির ভাগই টেম্পারার কাজ। প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে বেচেছিলেন কিছু ছবি। কখনও ছবি বিক্রি করেন নি প্রদর্শনী থেকে। সেই সময়ে সুভো ঠাকুরের ছবি কিনেছিলেন রঞ্জন রায়, ভাগ্যকুলের রাধানাথ রায় আর আসামের হেমেন বড়ুয়া।

পল্টন পড়ে যাচ্ছে—

'ঠিক রাত দশটায় বন্ধ হয়ে যেত ছ' নম্বর জোড়াসাঁকো বাড়ির দেউড়ি।

'বড় হয়ে অনেকদিন কত রাত কেটেছে দেউড়ির বাইরে। কখনও বারবিলাসিনীদের ঘরেও। খাবার বলতে বাইরের ঝাল ঝাল কাটলেট, মাংস ও আরও অনেক কিছু।

মা যখন মারা যান, তখন সুভো ঠাকুর ছিলেন ও বাড়িতেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় তিনি বাড়ির বাইরে।

'ছ' নম্বর বাড়িতে যদি কোনো ব্যাক্তি মানুষ সুভো ঠাকুরকে আকৃষ্ট করে থাকেন, তো তিনি হলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বিস্মৃতিচারণা'বলে নিজের যে আত্মজীবনীমূলক লেখা লিখেছেন, তাতে তিনি বিস্তারিতভাবে রথীবাবুর সম্পর্কে মূল্যায়নের চেষ্টা করবেন। তাঁর কথায়, 'মানুষ হিসেবে রথীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্র-নাথের চেয়েও বড়। বাড়ির অনেকে এবং বাইরের মানুষজন ভুল বুঝেছেন তাঁকে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।'

'বিস্মরণের সিংহদুয়ার খুলে সেই প্রাচীন অথচ চিরযুবা মানুষটি তুলে আনতে চান অজস্র সম্পদ। রথীন মৈত্রর সঙ্গে একসঙ্গে বার করেছিলেন 'অতিক্রমা'। একটাই সংখ্যা বেরিয়ে-ছিলো। তারপরই 'সুন্দরম'। আট বছর ধরে নিজের কান্না-ঘাম-রক্তর ফসল এ কাগজ। সবাই বলেছিলেন, বাংলায় আর্ট জার্নাল হয় না। ইংরেজিতে করুন। সুভো ঠাকুরের এক গোঁ—বের করব কাগজ, বাংলাতেই।

'তখন সরকারি চাকুরে। ডিজাইন সেন্টারের ডাইরেক্টর। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার আর ধার। সবই 'সুন্দরম'-এর পায়ে। দু বছর পর চাকরি ছেড়ে হোল টাইম পড়লেন সুন্দরম নিয়ে। নিজেই দেখতেন প্রুফ। শুয়ে থাকতেন ছাপাখানার টেবিলে। অনেক রাত ভোর হয়েছে ওখানেই। এ কাগজ করতে করতে শরীর

খারাপ। অজস্র দেনা মাথার ওপর।

'নামে মাসিক পত্রিকা হলেও 'সুন্দরম' ছিল অনিয়মিত। শরীর আর পয়সা দু দিক থেকেই পড়লেন ভেঙে। অনেক বাঙালি দিয়েছিলেন টাকা ধার। একশো টাকার জন্যে সুদ একশো কুড়ি টাকা। সুন্দরম হয়ে গেল বন্ধ।

'সুভো ঠাকুরের প্রথম বই 'মঞ্জরী'। কবিতার বই 'ডিকেণ্টার', 'প্যানসি ও পিকো' 'স্বপ্ন শেষ', 'কাঁকর' (কবিতা কাহিনী)। নাটকের বই 'রুদ্ররাজ'। নাট্য কথিকা 'পথিক'। আত্মজীবনীমূলক লেখা 'নীল রক্ত লাল লয়ে গেছে।' উপন্যাস 'অলাতচক্র।' অপেরাধর্মী লেখা 'মায়ামৃগ'। 'মায়ামৃগ' ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল মাসিক বসুমতীতে। এছাড়া ভ্রমণকাহিনী 'সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা'।

ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে অনেক বই। অনূদিত হওয়ার পর পর তাদের নাম, 'পিকক প্লিউমস', 'রাবল', 'ক্লেমস অফ প্যাশন, 'আই দি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইনফিনিট', 'মে ডে অ্যান্ড আদার পোয়েমস্', 'ব্লু 'ব্লাড টার্ন রেড।'

'অনেক বই-ই ছাপা নেই। হাতে নেই সুন্দরম-এর সবগুলো সংখ্যাও। নতুন করে ছাপা হয়েছে 'প্যানসি ও পিকো' আর 'নীল-রক্ত লাল হয়ে গেছে।

'আবার পুরনো সুতোর টানে কাশ্মীর। বংশী চন্দ্রগুপ্ত কিছুদিন ছবি আঁকা শেখেন সুভো ঠাকুরের কাছে। কিন্তু বংশী চন্দ্রগুপ্তের গুরু হওয়ার অহংকার নেই সুভো ঠাকুরের। ওঁর কথায়, 'আমি হয়ত বংশীকে শিল্পী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়ে-ছিলুম। গুরু তো কেউ হতে পারে না। অনেক কথা স্মরণে আছে আজও। ওর মতো সৎ বলিষ্ঠ শিল্পী এবং ওর মতো চলচ্চিত্রের শিল্পনির্দেশক অত ভালো আর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের দেশে আর আছে বলে মনে হয় না।'

'বংশী চন্দ্রগুপ্তকে নিয়েই ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে মন কষাকষি। 'ক্যালকাটা গ্রুপ ছাড়লাম, তার অন্যতম কারণ বংশীকে এই গ্রুপে

নেওয়া হলো না। মনে হয় বংশীকে নিলে ক্যালকাটা গ্রুপ সমৃদ্ধ হতো আরও। এই গ্রুপে বংশীকে জায়গা দেয়া না হলেও সত্যজিৎবাবু তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেন বংশী চন্দ্রগুপ্তকে।'

'ক্যালকাটা গ্রুপ তৈরি হয়েছিলো সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, প্রাণকৃষ্ণ পাল, কমলা দাশকে নিয়ে। তখন ক্যালকাটা গ্রুপ মানেই এক নতুন মুভমেন্ট। মূল পরিকল্পনায় সুভো ঠাকুর আর রথীন মৈত্র।

'কথায় কথায় সুভো ঠাকুর বললেন, 'কদিন আগে কাগজে দেখলাম, প্রদোষ দাশগুপ্ত দাবি করেছেন, ও'র বাড়িতে জন্ম ক্যালকাটা গ্রুপের। ঘটনাটা অবশ্য অন্য রকম। সে কথায় আজ আর ডিটেলে যেতে চাই না। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কে করেছেন, তা নিয়ে যেমন বড় একটা মাথা ঘামায় না কেউ, বরঞ্চ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে ভাবে, তেমনি আমিও বন্ধুবর প্রদোষ দাশগুপ্তের পক্ষেই বলছি। বন্ধুত্ব, অনেক দামী আমার কাছে। তাঁর বক্তব্যে রাখতে চাই না কোনো আপত্তি।'

'ছোট ভাই বাসব ঠাকুর থাকেন কলকাতাতেই। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পেছনে। বাসব ঠাকুর সুভো ঠাকুরের অনেক আগেই বিলেত যান।

পড়তে পড়তে পল্টনের মনে হলো বাসববাবু তো এখন শান্তিনিকেতনে। এ আর সি এ (রয়াল কলেজ অফ আর্টস, লণ্ডন) থেকে পাশকরা ছাত্রদের বয়েস হিসেবে সর্বকনিষ্ঠ উনিই। 'বাসবই প্রথম ভারতীয় যার ইন্টারভিউ নেয়া হল বিদেশী টেলিভিশনে। ওর বাংলা আধুনিক সাহিত্যের ওপর ভাষণ বেরোয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডিয়া সোসাইটি কাগজেই গীতাঞ্জলি-র অনুবাদ ছাপে।'

'ভাইয়ের কথা বলতে বলতে কোনো আবেগ ফুটে ওঠে না তাঁর মুখে। আলতো করে ছুঁড়ে দেন, 'যে কোনো কারণেই হোক

বাসবের প্রতিভার স্ফুরণ হয়নি। কিন্তু কবিতা, সাহিত্য, ললিত-কলায় ও ওর কাজের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে কি?'

আরও কিছু

'প্রথমবার বিদেশ গেছিলেন বাবা মারা যাওয়ার পর। খরচা-পাতি নিজের। ঝোড়ো হাওয়া হয়েই ঘুরে আসা। লণ্ডন, প্যারিস, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইটালি—সবচেয়ে কম দিন থাকার এমন সফর বোধহয় হয়নি আর।

'তারপর বিড়লাদের টাকায় গেলেন থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর। থাইল্যাণ্ডে মাস দুয়েক। বাকি সময় সিঙ্গাপুরে। থাইল্যাণ্ডের রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন ছবি।

'তৃতীয়বার বিদেশে ৫৪-৫৫ সালে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের টাকায়। নিজের ছবি টাঙিয়েছিলেন কায়রো, রোম, বেলগ্রেড, বেইরুট, দামাস্কাস আর বাগদাদে। সর্বত্রই প্রশংসা আর অভিনন্দন।

'এদেশে নিজের ছবির প্রথম প্রদর্শনী কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে। তারপর দুবার গভমেণ্ট হাউসে। পরের বার দার্জিলিংয়ে। তার-পর আবার গভমেণ্ট হাউসে। এরপর শিলংয়ে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে গৌহাটির কটন কলেজে। দু চোখে এখনও গভীর স্বপ্ন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার। বড্ড যাবার ইচ্ছে আফগানিস্তানে। পায়ে পায়ে আফগানিস্তান বেড়ানোর কল্পনা বেড়ে ওঠে বুকের গভীরে। এখনও বিশ্বাস করেন তাঁরও মামাবাড়ি আফগানিস্তানে। সেই সূত্রে দুর্যোধন তাঁর আত্মীয়।

'বছর দশ-বারো আগে চেয়েছিলেন জনাইতে আর্ট মিউজিয়াম গড়ে তুলতে। সরস্বতী নদীর ধারে অনেকখানি জমি। নাম দিয়েছিলেন 'কলাভূম'। বোধিবৃক্ষের চারা, আঙুরলতা, চেরি ফুলের গাছ, এমনি অনেক কিছু রোপণ করেছিলেন। বসিয়ে-

ছিলেন চন্দন গাছ, এলাচ গাছ। সিনেট হলের থাম নিয়ে-ছিলেন বয়ে।

'স্বপ্ন ছিল আর্ট সেণ্টার, আর্ট লাইব্রেরি হবে। বারো আনা কাজও হয়ে ছিলো শেষ। তারপর আর এগনো হয়নি। বাড়ি-ঘরদোর অনেকটাই তৈরি হয়ে পড়ে আছে। নিজে হাতে খুঁড়ে-ছেন ভিত। মিস্তিরিদের সঙ্গে হাতে হাতে এগিয়ে দিয়েছেন মালমশলা। এখনও ইচ্ছে ওটাকে সম্পূর্ণ করে যাবার। স্থানীয় লোকজন অবিশ্যি চায় ওখানে হাসপাতাল হোক।

'নাটকে অভিনয় করেছেন একবারই। নাহ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয়। নিজের লেখা নাটক 'রুদ্ররাজ'-এ সেজেছিলেন বাউল।

'ওঁকে নিয়ে ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তুলেছেন শান্তি চৌধুরী। কাজ শেষ। অনেক ভাষায় ডাবিং হবে এ-ছবি।

এখন তিনি কেমন

'তোর রেশমের মত পশমী অলকে
ফাঁসি লেগে গেছে হিয়া মোর
যতবার আমি ছাড়াবারে চাহি
কিছুতেই ওরে জট খুলে নাই
পাকে পাকে হিয়া অকারণে শুধু
জড়ায়ে গিয়াছে আরো জোর।'

'এসব লাইন 'ডিকেণ্টার'-এর।

'নিজের ভেতর এখনও তেমনই রোমাণ্টিক সুভো ঠাকুর। মেট্রোপলিটন বিল্ডিংয়ের তিনতলায় তাঁর ফ্ল্যাটে চারপাশে মুগ্ধ করানো অতীত। মাথার ওপর চার ব্লেডের ফ্যান। দেয়ালে প্রাচীন ঝাড়। আলো জ্বলে না। অথচ তার গায়ে বাতাস ছুঁলেই যেন শোনা যায় নূপুর নিক্কণ।

'কালীঘাটের পুরনো পট, নকশি কাঁথা, হরেকরকম শাড়ি আর শো কেসে সাজানো অজস্র দোয়াত নিয়ে সুভো ঠাকুরের গেরস্থালী।

'ময়মনসিংহের সেই বাহারি নারকেল কুরুনি, সাত সতের আরও কত কি টুকিটাকি পাওয়া যাবে একোণে ওকোণে। সবই সংগ্রহের নেশায়। এখনও কোথাও নকশি কাঁথা. বালুচরি শাড়ি, প্রাচীন পট বা ছবির খবর পেলেই যান ছুটে।

'১৯৬১ সাল থেকে এই ফ্ল্যাটে। রাসেল স্ট্রিটে ছিলো সুভম্ আর্ট গ্যালারি। সে বাড়ি পড়বে ভাঙা। সরে আসতে হয়েছে সেখান থেকে।

'নিজের সংগ্রহ সাজিয়ে রাখার মতো জায়গা নেই। খুঁজছেন। একচিলতে ঠাঁই পেলেই হলো। সাজাবেন প্রদর্শনী। দেখুক না লোকজন পুরনো সংগ্রহ। আরও কতশত ইচ্ছে।

'এখন ব্যস্ত স্মৃতিচারণে।

'চেয়ারে বসে আধশোয়া হয়ে আলো-অন্ধকার ল্যাপা ঘরের মধ্যে লিখছেন 'বিস্মৃতিচারণা।' দেখা শেষ নতুন কবিতার বই 'অতন্দ্র আলতামিরা'র ফাইনাল প্রুফ।

'ঘরের কোণে একটি ভাঙা প্রাচীন থামের সিকিখানার মাথার ওপরে রেকর্ড প্লেয়ার। সুর ওঠে বেজে। কখনও বিদেশি তান, কখনও রবীন্দ্রনাথ। মগ্ন দু-চোখে বেলোয়ারি অতীত।

'জীবনে নারী এসেছে নানা ভাবে, নানা চিত্রমালায়। বিভিন্ন নারী। তারা কেউ হয়েছে লেখার প্রেরণা, কেউ আঁকার। স্বদেশে ও বিদেশে—নানান রমণীকে পেয়েছের বহুরূপে। জীবনে নারীর নিবিড় উষ্ণ সান্নিধ্য ছাড়া আসতে পারে না পূর্ণতা কোনো মানুষের, বিশেষ করে যিনি জড়িয়ে আছেন কোনো শিল্পকর্মের সঙ্গে—এ-বিশ্বাসে সুভো ঠাকুর স্থির আজও।

'তোমার রূপের অন্ধ কূপেতে
বন্দী কোরেছ মোরে
বুঝি নিশ্বাস বুঝি তারি মাঝে হায়
ফেলিবে হত্যা কোরে
চারিধারে তব দেহের দেয়াল
দাঁড়ায়ে ঘিরিয়া আছে
তব রূপ তায় মৃত্যুর মত
থমকি বুকের কাছে!' (ডিকেণ্টার)

'প্রায় কিশোর বয়েস থেকেই প্রেমের অভিষেক। সিংহাসনে আরোহণ যৌবনের প্রথম দিনটি থেকেই। বুকের গভীরে চাল-চিত্রে কতশত মুখ। তাদের স্মৃতি মন্থনে নারাজ সুভো ঠাকুর। কি পেয়েছেন, কি পাননি—তার হিসেব মেলাতেও নেই আগ্রহ। তবে জীবনের প্রতিটি কুঁড়ি, ফুলের গন্ধ তিনি অনুভব করেছেন আপন করে। বহু প্রেম তাঁকে দিয়েছে অনুপ্রেরণা। এগিয়ে চলার মন্ত্র। আজও সুন্দরের পূজারী তিনি, প্রেমের আচার্য। তাঁর চিত্রমালায় ছবিতে মেহনতী মানুষের জীবনের পাশাপাশি এসেছে সুন্দরীরা। নানান ভঙ্গিমায়।

'ঠোঁটেতে জমাট বেদানার দানা
দেহ তো দ্রাক্ষালতা
গতি-ভঙ্গিতে বহ্নিশিখার
রহিয়াছে সহায়তা।
স্তনের উপর কামনার কণা
হয়ে গেছে কিস্‌মিস্‌
মন্থন শেষে উঠেছিল যাহা—
তব চোখে সেই বিষ।' (ডিকেণ্টার)

'জীবনের বহতা নদীকে এবাবেই দেখতে চেয়েছেন সুভো ঠাকুর। নন্দলালের সঙ্গে একবার এই নারী প্রসঙ্গেই বাদানুবাদ। নন্দবাবুর ড্রইং প্রাণহীন মনে হয় সুভো ঠাকুরের কাছে। কিরকম যেন মরা মরা। আসলে উনি খালি মন্দির দেখছেন, মহিলা দেখেন নি। ও'র আঁকায় গতিময়তা আসবে কোত্থেকে! নারী দেহ, তার বিশেষ ভঙ্গিমা, মুদ্রা না জানলে কি ভাবে ভালো ছবি আঁকা হবে! তাই নন্দলালের আঁকা পায়ের গোড়ালি, ঊরু এত নিষ্প্রাণ। এসব কথা শুনিয়েছিলেন নন্দলালকেও।

'ও'র অনেকখানি শ্রদ্ধা রামকিংকরের ছবি আর ভাস্কর্যে। কি গতি, কি লাইফ। 'রামকিংকর নারী দেখেছেন। শিল্পে তারা অত্যন্ত সরবে উপস্থিত।'

'আলতামিরার গুহাচিত্রের মতো ইতিহাসমাখা এই মানুষটি যুবক হয়ে যান আড্ডায়। সরস মন্তব্য, সাহিত্য-শিল্পের সূক্ষ্ম রসবোধের টানে টেনে আনেন ও'র থেকে বয়েসে কম মানুষজনকে। সেই ঢিলেঢালা আলখাল্লা, জোব্বা, দাড়ি, রুপোর চেন দেয়া পকেট ঘড়ি। ঘাড় অব্দি জবাকুসুম-এর গন্ধমাখা পাটকরা চুল আর বনেদী আতিথেয়তা নিয়ে এখনও কোনো প্রাচীন বৃক্ষের মতোই তিনি সজীব, প্রাণবন্ত। তাঁর শিকড় নিহিত কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, রূপে, রসে, ঐতিহ্যে।

'দুই ছেলে বাইরে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। থাকে কানাডায়। নিজে এখন একলাই, সঙ্গী একজন ভৃত্য। খাওয়া-দাওয়ার পাট বাইরেই। এখনও ট্রু সেন্স বোহেমিয়ান অ্যাণ্ড রোমাণ্টিক। বড় ছবি আঁকার ইচ্ছে যথেষ্ট। জায়গা পেলেই বসে যাবেন আঁকতে।

'চোখের দৃষ্টিতে ইদানীং কিছু ঘাটতি। শরীরও নয় তেমন ভালো। তবুও বুকের মধ্যে সাতটা তেজী ঘোড়ার কেশর ফোলানো পা ঠোকাঠুকি সর্বদাই।

'কোনো ম্লান দুপুরে খাঁ খাঁ মেট্রোপলিটন বিল্ডিং। টানা

লম্বা করিডোর শূন্য, বড়জোর একটা বেড়াল। আধ-ভেজানো দরজার আড়ালে এই মানুষ আধশোয়া আরামকেদারায়। আধবোজা দু-চোখে খেলে বেড়ায় কোন মায়া? তিনি কি দেখতে পান সেই বাড়ি? সে কলকাতা। মোটা থামের পাশ দিয়ে রোদ্দুরের আঁচল পড়েছে লুটিয়ে। সুন্দরী নারীরা নানান সাজে সেজে চলে বেড়াচ্ছে। ওই তো শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপরই তাঁর ঘরে আসা-যাওয়ার ভিড়।···বক্তৃতা হচ্ছে মাঘোৎসবের মঞ্চে। মহর্ষি'ভবনের উঠোনে কতশত মানুষজন······।

'···যুবক তিনি,উড়ছেন হয়ে রঙিন প্রজাপতি। নবাব-বাদশার ভূমিকায় দু-হাতে ওড়াচ্ছেন মুঠো মুঠো টাকা। সদালাস্যময়ী সুন্দরীরা ছেঁকে আছে তাঁকে। ঠোঁটেব গোড়ায় সফেন মদ। হাতে পুড়ছে দামী বিদেশি সিগারেট। তারপরই কোনো মৃত্যু, কখনও বিরহ-জ্বালা···। বেজে উঠছে দ্বিতীয় বিশবযুদ্ধের মৃত্যু, সাইরেন। বিপন্ন মানবিকতা···।

'নিজেকে নিয়ে, শেষ দিনের কথাটিও রেখেছেন ভেবে। 'মরে গেলে তুলে রেখ তমালের ডালে'—নয়। যদি বিদেশেই মারা যান, তাহলে তাঁর দেহ যেন ফেলে দেয়া হয় প্রশান্ত মহাসাগরে। এমনটিই ইচ্ছে। থাকবে না কোনো শ্রাদ্ধ-শান্তির বালাই। বিশ্বাসও নেই একবিন্দু ওসবে। তারপর ভাসতে ভাসতে ভাসতে······।

তারপর একদিন সেই আদি মৃত্তিকা থেকে হয়ত ফুটে উঠবে ফুল। পুষ্প থেকে বীজ। বীজ হবে বৃক্ষ। তারপরও শুধু ফুল ফুটিয়ে যাওয়া। ফলের প্রত্যাশায়।

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। শত হলেও সুভোদার বায়োগ্রাফি। কত কি করলেন মানুষটা। ভাবছিল পল্টন। 'অগ্রগতি',

'সুন্দরম', 'ভবিষ্যৎ। আর প-নী—'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' বলে একটা কাগজ করবেন বলে মাথায় পোকা নাড়ালেন ক'দিন। একটা কবিতা ছেপে নাকি এক হাজার টাকা দেবেন। সঙ্গে আর্ট-অবজেক্ট-এর ছবি।

ও'র স্মোকিং পাইপের সংগ্রহ, ছড়ির সংগ্রহ—যার মধ্যে আছে নারিয়েল হোয়েল-এর দাঁতের ছড়ি, আফ্রিকার উইচ ক্রাফট করা ভুডু ম্যাজিসিয়ানের লাঠি, বর্ধমানের মহতাবচাঁদের মুখের চেহারা-অলা হাতল সমেত ছড়ি। শাহজাহানের পানপাত্র, নেপোলিয়নের দোয়াত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শবযাত্রার শুকনো মালা, রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল, দ্বারকানাথের বসার চেয়ার, প্রদ্যোৎ-কুমারের ঝাড়, রামমোহনের চিঠি, উইল।

হুজুর কফি দেব?

দাও—ব্ল্যাক কোরো।

লেখাটা পড়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল পল্টন। তার চোখের সামনে তখন জাফবানি অঙ্গরাখা পরা সুভো ঠাকুর। যিনি রিকশা চড়তে ভালোবাসেন। ফ্লুরি, স্কাইরুমের খাবার, ভাঁড়ের চায়ে যাঁর সমান আসক্তি। অপর্ণা সেন যাঁকে দেখে 'ফ্লুরি'-তে সিট ছেড়ে এগিয়ে এসে কথা বলেন। সত্যজিৎ রায় 'ঘরে-বাইরে'-র শ্যুটিং করতে গিয়ে একটি পিরিয়ড পিস—কাচের ডোম ভেঙে ফেলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দেন ও ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠান, ক্ষতিপূরণ হিসেবে। সুভোবাবু চেক ফেরত দেন। চিঠিটি রাখেন।

চেকটি ফেরত দিতে গিয়ে তাঁর চিঠিতে সবিনয়ে লেখেন—চেক ফেরত দিলাম। আপনার চিঠিটা রাখলাম। টাকার থেকে বন্ধুত্ব অনেক বড়।

পল্টন দেখতে পাচ্ছিল হোয়াইট লেডলয়ের তিন তলায় কলকাতার শেষ বোহেমিয়ান একটি চার টুকরো প্রাচীন থামের একটি টুকরোর ওপর রেকর্ড প্লেয়ার রেখে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজাচ্ছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোহর ছড়ানো গলা, সেই বাড়ির বাতাসে ছড়িয়ে

যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা আগেই তিনি তাঁর মাথায় জবাকুসুম তেল ঠাসার জন্যে কাজের ছেলেটিকে দশটাকা দিয়েছেন। আর তারপর দেয়ালে কাঠের ড্রয়ারের আড়ালে রাখা নানান শেপের ঘড়া-কলসি, শুধু টেবিল ল্যাম্পের আলো ফেলে দেখানোর জন্যে আরও দশ।

আজ দুপুরে পাতলা মুসুর ডাল দিয়ে গোবিন্দভোগ চালের ভাত খাবেন সুভোবাবু। সঙ্গে মুচমুচে আলুভাজা। গন্ধ লেবু। একটি সবুজ কাঁচালঙ্কা। আর দু টুকরো চিকেন।

একতলায় সেরেস্তা-ঘরে দত্ত ক্যাসেল-এর সরকারমশাই, এখনও বসেন। এ-বাড়ির নানান ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে থাকেন। এখন সরকারমশাইয়ের সামনে কানহাইয়া বাদোরিয়া। মাড়োয়ারি। ধর্মে জৈন। বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছে। সন্তানাদি হয়নি। আর্ট-অ্যান্টিকের ব্যবসা। এ-বাড়ির অনেকটা তার লিজ নেওয়া। সেখানে কাঠের পার্টিশন দিয়ে খোপ করে নিজস্ব ভাড়াটে বসিয়েছে। সেলামি, পাগড়ি, অ্যাডভান্স, মাসের ভাড়া—সব মিলিয়ে মোটা আয়।

আকাশে একেবারেই মেঘ নেই, রোদও কেমন শাদা রঙের। তার দিকে খালি চোখে বেশিক্ষণ তাকান যায় না। উঠোনে নহবতখানা, এ-বাড়ির আরও আরও ঘুলঘুলির ভেতর সংসার পাতা গোলা পায়রার ঝাঁক নেমেছে উঠোনে। কানহাইয়া তাদের দানা দিচ্ছে। পরকালের সিঁড়ি পরিষ্কার রাখার জন্যে।

খুব সকালে পাড়ার কুকুর আর কাকেদের জন্যে ছেঁড়া রুটি বরাদ্দ থাকে। তারপর পায়রাদের দেয়া। কানহাইয়া যেদিন ভোরে উঠতে পারে না সেদিন শুধু পায়রাদের জন্যে গমের দানা, ভেজা ছোলা। তখন কাকেদের তেমন করে পাওয়া যায় না।

সরকারমশাইয়ের মাথার ওপর ফুল স্পিডে চলা ডি সি ফ্যান। শাদা কেমব্রিকের হাফ হাতা শার্ট আর ধুতি পরা সরকারমশাই

ঘামছিলেন। মাথার চুলও পাতলা হয়ে এসেছে। কানহাইয়ার মাথার মাঝখানটি চকচকে, চারপাশে চুলের বেড়া। সেটুকু কলপ দিয়ে, ঘাড়ের পাকা চুলটি চেঁচে সুন্দর করে সাজানো। ভারি ফর্সা গালে খুব ফিকে বসন্তের দাগ। থ্যাবড়া নাক। পুরু ঠোঁট। পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি-গোঁফ। অরগেণ্ডির গা-দেখানো পাঞ্জাবি, তার ভেতর দামি সামারকুল স্যাণ্ডো গেঞ্জি। মিলের ফাইন ধুতি। গলায় সরু সোনার চেন। দুহাতে গোটা-ছয়েক আংটি, গ্রহ আটকানোর পাথরসমেত। পাঞ্জাবি থেকে উড়ে আসা জেসমিন-আতরের সুগন্ধ।

পায়রাদের ডানায় এ-বাড়ির রোদ জড়িয়ে যাচ্ছিল। দূরে, এ-বাড়ির ভেতর দিকের উঁচু বারান্দায় বসে থাকা তাগড়া হুলো বেড়াল পায়রাদের নামা-ওঠা দেখছিল। আজ বোধহয় এ-বাড়ির দোতলা একতলা মিলিয়ে দুটো বিয়েবাড়ি। ডেকরেটরের লোক-জন, কেটারিংয়ের ঠাকুর-চাকর, ম্যানেজার ঘোরাঘুরি করছিল।

কানহাইয়া তার লিজ নেয়া পোরশানে বিয়েবাড়ি ভাড়া, যাত্রার মহড়া, আলকাতরা, আলতার গো-ডাউন, সবই করে নিতে পেরেছে। তারপর নতুন বাজারের অনেকেই এ-বাড়িব একতলার নানান অন্ধকার কোণকে নিজেদের গোডাউন করে দিয়েছে। সে বাবদ আলাদা আলাদা ভাড়া। খুব হালকা গোলাপি রঙের অরগেণ্ডি-পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে কানহাইয়ার গায়ের উজ্জ্বল চামড়া দেখা যাচ্ছিল। যেন বা জলতলে পড়ে থাকা কোনো মার্বেলের টুকরো।

পল্টনকে দেখেই কানহাইয়া শরীর সামান্য ঝুঁকিয়ে পরিষ্কার বাংলায়—আ রে, বড়বাবু যে প্রাতঃপ্রণাম। প্রাতঃপ্রণাম।

টাকমাথাটি ঘাড়ের ওপর ভেঙে, শরীরের সামনের দিকে অল্প নুয়ে পড়েছে। বুক-পেটের মাংসের কাছে টাইট হয়ে গেছে অর-গেণ্ডির গোলাপ-রং।

আমি আবার বড়বাবু কবে হলুম—ভাবতে ভাবতে নিজের

মাথাটি অভ্যাসে সামনের দিকে একটু নামিয়ে 'ঘং' শব্দে কেশে নিতে পারে পল্টন। তার ঘুমফোলা বড় বড় দুচোখে কাশির দমকে জেগে ওঠে অশ্রুরেখা।

ভালো সিগারেট খাবে ?

এই তো খাচ্ছি। লিটনের দেয়া, দু আঙুলের ফাঁকে অর্ধ-দগ্ধ জনপ্লেয়ারটি দেখায় পল্টন।—তা তোমার আজ ইনকাম কেমন কানাই ? দু-দুটো বিয়েবাড়ি মনে হচ্ছে—বলতে বলতে নিজেকে গদিমোড়া চেয়ারটির ওপর ছেড়ে দেয় পল্টন।

আ রে যেতে দে ভাই। যেতে দে ভাই। এ সব ছোটোমোটো কেস। সামান্য দু-চার হাজার।

যে কোনো কথার পিঠেই 'যেতে দে ভাই, যেতে দে ভাই'টুকু খুব যত্নে বসিয়ে দিতে পারে কানহাইয়া। এমন কি তার মা গঙ্গাকিশোরী বাদোরিয়ার মৃত্যুর পরও, তাদের সংস্কারমতো শেষ যাত্রার আগে কোনো জৈন মন্দিরে গিয়ে শরীরটি রাখার নিয়ম। ডেডবডি নিয়ে বেরবার পর তা পাড়ার শিবমন্দিরে রাখল কানহাইয়া।

শ্মশানবন্ধু হিসেবে পল্টন ব্যাপারটা পয়েন্ট আউট করালে নির্লিপ্ত মুখে কানহাইয়ার সাদা জবাব, ও যেতে দে ভাই। যেতে দে ভাই। মন্দির হলেই হলো। শিব আর পরেশনাথ!

চৌকির ওপর মোটা গদি, তা শাদা চাদরে ঢাকা। গোটাদুই তাকিয়া আছে। একটা উঁচু জলচৌকি। সরকারমশাই গদির ওপর নিজেকে আধশোয়া করে জলচৌকির ওপর লাল খেরো বাঁধানো খাতায় কী যেন হিসেব করছেন। সরকারমশাই পার্ট-টাইমার হিসেবে কানহাইয়ার হিসেব-পত্রের কিছু কাজ করে দেন। এ-বাড়ির সবাই তা জানে। কিন্তু পুরো বিশ্বাস করে না। যেমন এ-বাড়ির লোকেরা নবীন দত্তের আমলেও বিশ্বাস করত চুল কাটানোর নাপিত, ইলেকট্রিসিয়ান, যাদের আমরা মাস মাইনে দিয়ে খাস লোক হিসেবে রেখেছি, তারা অন্য কোথাও পয়সার

বিনিময়ে কিছু করে না। মাইনে করা ছুতোর, ধাঙড়—সব ছিল এ-বাড়িতে। সে সময়েই লালমোহন দত্তের কোনো কাকা জ্যোৎস্না রাতে কার্নিশের ওপর ময়ূর হয়ে উড়তে চেয়েছিলেন।

চাঁদ পাওয়া, আকণ্ঠ নেশা করা সেই দত্ত-সন্তানকে রাস্তার কঠিন পাথর মৃত্যু হয়ে মাথা থেঁতো করে দিয়েছিল। এই গরমের সকাল পেরিয়ে দুপুরে পেঁছানোর সময়টিতে পল্টন সেই সব কথা মনে করে আরও বেশি বেশি ঘেমে উঠছিল। এ-বাড়ির খুব উঁচু উঁচু দরজায় ততক্ষণে সরে যাওয়া রোদের তাপ লেগেছে। খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় পায়রারা উঠে গেছে নিজস্ব নিবাসে। ছায়ায় একটা বেড়াল। পল্টনের হঠাৎই মনে পড়ল এখনও ব্রেক-ফাস্ট হয়নি।

সরকারমশাইয়ের থেকে তিন হাত দূরে ওই গদির ওপরে বসে থাকা কানহাইয়া বাদেরিয়া আবারও বিনয়ে, স্বাভাবিক অভ্যাসে শরীর ঝুঁকিয়ে পল্টনকে বলল, আবারও পায়ের ধুলো দেবেন বড়বাবু।

ওপাশে নাচঘরের দরজা পেরিয়ে কনসার্টের ক্ষীণ শব্দ, ক্লারি-ওনেটের তীক্ষ্ম বিষাদ-ভরা সুর কোরিন্থিয়ান ডিজাইনের থামের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেতে দূরে সরে যাচ্ছিল। মাথা নিচু করে পল্টন আরও একবার কেশে ফেলল।

ছয়

যামিনী রায়ের ছবির বেস কালারে ডুবেছিল পল্টন। তিলকের এই ফ্ল্যাটে এখন জোরালো আলো। পবনপুত্র ডে অ্যান্ড নাইট ক্যুরিয়ার সার্ভিসের গোটা দুই মোটর সাইকেল, একটা ভাড়ার অ্যামবাসাডার তখনও নিচে দাঁড়িয়ে। সুসান চলে গেছে একটু আগে। পীযূষও। কার্নিভাল অ্যাড এজেন্সির সুবিমল তার কাঠের মাচায়। সেখান থেকে চলকে-আসা টেবিল ল্যাম্পের আলো.

এ-ঘরের মেঝেয় একটা ফালিমত কি যেন তৈরি করেছে। দেয়ালের ধার ঘেঁষে ডগি, রকি, গোল্ডি শুয়েছিল একটু আগে। প্রফুল্ল ওদের নিয়ে গিয়ে কলার আর চেন লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের গম্ভীর গলার শব্দ এখনও এই ফ্ল্যাটের বাতাসে।

বড় আতশ কাচ যামিনীবাবুর সইয়ের ওপর ফেলে দেখে নিতে চাইছিল পল্টন। তার মনে পড়ল বেলেতোড়ের যামিনী রায় কলকাতায় বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির বাড়ি ভাড়া থাকতেন। রবীনবাবুর ভাইপো সমীর চাটার্জি আমার বন্ধু। সমীর বলেছে, আনন্দ চ্যাটার্জি লেনেই থাকতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সপ্তপদী' সিনেমায় হিট হওয়ার পর পাড়ায় সাধারণ মানুষও তারাশঙ্করবাবুকে চিনে ফেলল।

আনন্দ চ্যাটার্জি ছিলেন সমীরের ঠাকুর্দা লোকনাথ চ্যাটার্জির পিতামহ। আনন্দবাবুদের জমি দিয়ে বসান শোভাবাজারের রাজা। মিত্রা সিনেমা এখন যেখানে, সেখানে স্টিল ফাউণ্ড্রি করেছিলেন আনন্দবাবু। তা পরে বিক্রি হয়ে যায়।

যামিনী রায়ের সইটি আবারও ভেসে উঠল ভারি আতশ কাচের ভেতর দিয়ে। সমীর বলেছিল, বাংলার গভর্নর তখন মিস্টার কেসি। গভর্নর আর তার বৌ যামিনীবাবুর কাছে এসেছিল রোলসরয়েস চেপে। সঙ্গে ইউরোপিয়ান গার্ড। সমীররা ফুটবল খেলছিল গলিতে। তাদের বল হঠাৎ গিয়ে লাগল গভর্নরের গাড়ির কাচে। এ নিয়ে কেউ কিছু বলেনি। কেসি তখন গাড়ির ভেতর।

গোপাল দাস একটু দূরে, সোফায়। এ-ঘরের গোটা তিন টেবিল ল্যাম্পের আলো শুধুই যামিনী রায়ের আঁকা ছবিতে। এই আলোয় ওশান ব্লু আর টারকিশ ব্লুয়ের ফারাক খুব একটা বুঝতে পারছিল না পল্টন। তবু মোটিফে, রেখার টানে, রঙে যামিনী রায় বেরিয়ে আসছিলেন, জেগে উঠছিলেন বারে বারে।

গোপাল দাসের ফুল প্যান্ট মোড়া পা ঘরের আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট নজরে পড়ছিল না। তার পেটের ওপর আলো। পরিষ্কার করে কামানো মুখ অন্ধকারে মিশে গেছে। কেবল মাথার ছাই-রঙা টুপিটি কোথা থেকে যেন আলো পেয়েছে।

ঠিক আছে। পল্টন ঘাড় নাড়ল। দুলাল হেসে উঠল। তার সাজানো শাদা দাঁত ফুটে উঠল ঘরের অন্ধকারে। স্বস্তি। ডিল্ হয়ে যাবে। হাতের সিগারেটের মুণ্ডু আগুনসমেত মুচড়ে, অ্যাশপটের বুকের ভেতর বসিয়ে দিল গোপাল।

তিলক চৌধুরীর ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেটের ওপর যামিনী রায়ের বেড়াল, সাঁওতাল নাচিয়েরা আলো-আঁধারে শুধু ছবি হয়েই পড়েছিল।

তাহলে গোপালবাবু—শাদা খামের ভেতর পরিষ্কার, বুঝি বা ইস্ত্রি করা একশ টাকার নীল নোট পর পর গুনে ফেলতে পারছিল তিলক চৌধুরী।

নতুন টাকার এক ধরনের গন্ধ থাকে। অনেকটা দূরে বসেও গোপাল সেই ঘ্রাণটুকু পেয়ে যাচ্ছিল।

কথামত স্কচ রেডি ছিল। প্রফুল্ল সাজিয়ে দিল। রুপোর ট্রে-তে বেলজিয়ান গ্লাসের ডিকেন্টার। রুপোর আইস ট্রে। বরফ তোলার ছোট চিমটেটিও রুপোর। খুব পাতলা, শাদা চাইনিজ পোর্সিলিনের বওলে হিমায়িত আঙুর। আর সবুজ গা থেকে ফ্রিজের কুয়াশা এই ঘরের বাতাসে মিশে যাচ্ছিল। আনারসের টুকরো ছিল। ফোরেন চিজ্-এর টুকরো। হাড়-ছাড়া ভাজা মুরগি।

ড্রিংকস সাজিয়েই প্রফুল্ল যামিনী রায় দুখানা খবরের কাগজে ভালো করে মুড়ে সরিয়ে দিতে পেরেছে।

আচ্ছা, তুই কি হবু রায়-গবু রায়ের গপ্পো জানিস! স্কচের ভিতর সোডার ফেনা মরে আসছিল।

তিলক মাথা নাড়ল, না। তারপর গ্লাস হাতে নিয়ে চিয়ার্স

বলে সে পল্টনকেও গ্রাস তুলে নিতে বাধ্য করে। আর এই চিয়ার্সের ঝোঁকে হবু রায় গবু রায় মুছে গিয়ে আড়াইপাক গড়-গড়ার নলের প্রসঙ্গটি জেগে ওঠে।

গ্রাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ব্লু বার্ডে যেতে পারে পল্টন—তুই যদি পুরনো অয়েল পেইন্টিং দেখিস, দেখতে পাবি মাত্র তিন জন মহারাজ—তখনকার নেটিভ স্টেটের, আমি বাংলার কথা বলছি—ভাওয়াল, বর্ধমান, আর পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ টেগোর—এঁদের গড়গড়ার নলে আড়াই প্যাঁচ। মাসে মাসে হস্তবুথ—আয়, তখনকার দিনেই পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ টাকা। পাতলে দ থেকেই মহারাজা টেগোর পেতেন মাসে এক লক্ষ টাকা। মহারাজকুমার মাসে হাতখরচা পেতেন পাঁচ হাজার। নাতিদের মাসিক হাতখরচা একশ টাকা।

আরও আশ্চর্য যতীন্দ্রমোহনের উইল। কোন নাতি বেঁচে থাকলে কী পাবে, আগে মরলে তার ছেলে, ছেলের বৌ…। বলতে বলতে চিজের হিমমাখা টুকরো অ্যালকোহলে নুয়ে-পড়া জিভে বসিয়ে দিতে পেরেছিল পল্টন দত্ত। তারপর দু-এক টুকরো আঙুর। ভাজা-মুরগির গন্ধে বুঝি বা চঞ্চল হয়ে ডগি, রকি, গোল্ডি পর পর ডেকে উঠতে পারছিল। তিলক জানে ওদের ছেড়ে দিলেই ড্রিংকস সেসানের সামনে বসে বসে শুধুই জিভের লালা ঝরিয়ে যাবে, লোভে। আকাঙ্ক্ষায়। মুখ দেবে না, সেটুকু আনুগত্য আছে।

যা বলছিলাম, হবু রায়-গবু রায়। নিজের কথার ছেঁড়া সুতোটি এভাবেই জুড়ে নিতে পারে পল্টন। হবু রায়-গবু রায়ের অবস্থা আমার আর লিটনের মতোই—যমজ নয়। তবে খাতায়-কলমে ব্যাচেলার। যে বাড়িতে থাকে, তার একতলাটা পুরো গোয়াল। সেখানে শুধুই গোরু-মোষ। জার্সি, হরিয়ানা, ক্রস ব্রিড। একতলাটা গোরু আর গোয়ালা, খটিকদের বাস। দোতলায় উঠতে হয় গোরু-মোষ ডিঙিয়ে।

একটা গুটেনবার্গ বাইবেল নাকি ওদের জানাশুনো একজনের কাছে আছে। খবরটা শুনে দোতলায় উঠে দেখি হবু বসে। ছাদ থেকে লম্বা রডের সিলিং ফ্যান নেমে এসেছে প্রায় পেটের কাছে।

পল্টনের বলার সঙ্গে সঙ্গে তিলক দেখতে পাচ্ছিল দত্তকে দেখেই হবু উঠে দাঁড়াল। তার পেটের কাছে ঘুরে-চলা পাখার ব্লেড। গবু বলল, এসো এসো পল্টন।

তারপরই চা দেয়া। দামি ক্রকারিজে সুগন্ধী চা, দিয়ে গেল কাজের ছেলেটি। চায়ের কাপের আড়ালে ব্রিটানিয়া ক্রিম ক্র্যাকার। গবু বিস্কুট দেখতে না পেয়ে বলল, কি হলো দাদা, পল্টনকে খালি চা! বিস্কুট দাও।

দেব না। পল্টনকে বিস্কুট দেব না। তুমি কি করতে পাব! বলতে বলতে হবু বিস্কুট তুলে নিল।

চায়ের সঙ্গে আমার আর বিস্কুটই নেয়াই হলো না। বলতে বলতে পল্টন টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিল।

গবুর মস্ত গুণ, যে কোনো পাওনা টাকা আদায় করে দেবে। টাকা আদায় করে দিলেই তার ওপর টেন পার্সেণ্ট। আর তার ইংরেজি—দাদা কিক্। পিঠে ব্যথা।

যদি জিগ্যেস কর, কেন? জবাব পাওয়া যাবে—টেক টু ফিশ। কই মাছ। দাদা অ্যাঙ্গরি, দিল চালিয়ে—পল্টন আগের কথার সঙ্গে এই কথাও মিশিয়ে দিতে পারে, সঙ্গে নতুন সিগারেট।—সেদিন আর গুটেনবার্গের বাইবেল-প্রসঙ্গ বলা গেল না। তার আগেই মারামারি।

এভাবে অনেকক্ষণ অ্যালকোহল-তামাক-আক্রান্ত সময় চলে যায়! তারপর পল্টন ভাতে বসে। ভাত, মুসুর ডাল, পাতলা পাতলা করে কাটা মুড়মুড়ে আলুভাজা, মাটন।

অ্যালকোহল একটা সময় পর্যন্ত খিদে তৈরি করে, তারপর তো সবটাই জড়তায়, ঘুম অথবা ক্লান্তিতে ডুবে যেতে থাকে। পল্টন গন্ধলেবু আর মুসুর ডাল-মাখা ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে

কখনও আলুভাজায় কখনও মাটনে যেতে পারে। নিউ মার্কেটের গ্রাম ফেড মাটন। হাতে মাংসের চর্বি জড়িয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। কপালে ঘাম জমছিল পল্টনের। খাওয়ার থেকে তার নাড়াচাড়া হচ্ছিল বেশি।

আসলে পাথুরেঘাটার 'প্রাসাদ'-এ বুঝলি—বলতে বলতে পল্টনতার স্বপ্নে চলে যেতে পেরেছে—প্রদ্যোতকুমার, প্রসন্নকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন প্রবোধেন্দ্রনাথ—। ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে সুরেন বাবুর্চির রান্না যারা খায়নি, সুরেনরা তো বংশপরম্পরায় ওই বাড়িতে। তবে আজকাল আর কেউ রান্নার কাজ করে না। বরং পলিটিক্যাল গ্যামব্লিংয়ে প্রাসাদের একটা পোরশান—

পল্টন একটু একটু করে পাথুরিয়াঘাটার রান্নাঘরে জড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রদ্যোতকুমারের বাবুর্চি তখনকার গভর্নরের ফ্রেঞ্চ বাবুর্চির কাছে ফরাসি রান্না শিখতেন। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ির কিচেনে হোসেন কারি, দমপকতু, বিরিঞ্চি-বেগুন, মৌলি হিংলি, হাঁড়িকাবাব, আমশোল—

তুমি তো ভাত নাড়াচাড়া করছ। কিছু তো—

সে রান্না তোরা খেলি না। আমিও খাইনি, তবে হিংলি খেয়েছি। আলু, বেগুন, কুমড়ো, কপি দিয়ে তোর নিরামিষ ঝোল হিংলি—এখনও জিভে লেগে। কাঠিতে গুঁজে দেয়া কুঁচো চিংড়ি, আলু, আদা আগুনে ঝলসে একটা দারুণ প্রিপারেশনের পর একবাটি ঝোলের মধ্যে—বলতে বলতে একটা মাংসের টুকরো, বড় ভালো হয়েছে, বড় ভালো হয়েছে। বেশ বেশ। বেশ হয়েছে, বলে পল্টন মুখে দিয়ে, আস্তে মেঝেয় ভর দিয়ে উঠে পড়ল। আগেই কথা ছিল খাওয়া হবে মেঝেয় বসে আসন পেতে, কাঁসার থালা। কাঁসার গ্লাস।

বড় করে ঢেকুর তুলল পল্টন। কোনো কারণ ছাড়াই তিলকের তিনটি রিট্রিভার পর পর ডেকে উঠল।

ফুলতোলা সিল্কের রুমালে ফিরদৌসের সুবাস। মুখ

মুছতে মুছতে পল্টন টের পেল তার মাথার ভেতর স্কচ একটু একটু করে ভারি আঠা হয়ে জড়িয়ে যেতে চাইছে। প্রফুল্ল ততক্ষণে এঁটো বাসন সরিয়ে নিতে পেরেছে।

সাত

ড্যানিয়েল বা হজেসের আঁকা ছবি ইণ্ডিয়ান পেইণ্টারকে দিয়ে হুবহু নকল করে কোনো বড় আর্ট কালেকটার উপহার দিয়েছিলেন হায়দরাবাদের নিজামকে। নিজের পার্সোনাল কালেকশানের জিনিস, তার বদলে নিজামের ঘর থেকে এলো দামি জুয়েলারি। ছবিটিতে মিথ জুড়ে গেল। শোনা যায় এক সময় অতুল বসু নাকি এই ছবি কপি করার কাজ করতেন।

বলতে বলতে সিগারেটে একটা ছোট টান দিল অমৃতলাল। তারপর দেখতে পেল তার সামনে শরবতের গ্লাস হাতে বুলু বসাকের খাস লোক, পটাই। আঠারো মাস বন্ধ থাকা 'দৈনিক খবর'-এর আর্ট ক্রিটিক। শনি-রবিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, বিড়লা অ্যাকাডেমিতে দুপুর, বিকেল, সন্ধে কাটত ছবি দেখে। কিন্তু অমৃতলালকে ডেকে আজকাল খুব একটা কেউ বসায় না। চা, কফি, ঠাণ্ডা—এমন বলার লোকও কমে গেছে। নবীন শিল্পীরা তাকে দেখে একটু গায়ে-পড়া হয়েই অমৃতদা অমৃতদা করে ওঠে না।

আপনাদের 'খবর' তো আবার খুলবে শুনছি। প্রধানমন্ত্রী নিজে নাকি—

অসম্ভব বুলুবাবু। সবেরই একটা অঙ্ক থাকে। 'খবর' খোলার কোনো অঙ্ক নেই। তিরিশ কোটি টাকা লায়াবিলিটি, কে, কোন ব্যাঙ্ক, কোন সরকার নেবে বলেন তো? আর কেনই বা নেবে?

থুতনিতে পাকা দাড়ি। মাথার চুলে কলপ। ফেডেড জিনস্

তার ওপর খাদির ফতুয়া। পায়ে পাতলা কোলাপুরি। কলপ-করা চুলে কোথাও কোথাও রং মুছে গিয়ে লালচেমতো শাদা জেগে উঠেছে। বিশেষ করে সিঁথির কাছে। কানের পাশে।

হরলালকা কোনো খবর দিল? অমৃতলাল জানতে চাইছিল।

ঠোঁট ওল্টাল বুলু বসাক। যার সাদা মানে—খবর নেই।

উঠোনে ছায়ায় কাইজার ঝিমিয়ে আছে দাঁড়ের ওপর। বেলে-পাথরের ওপর রোদ পড়ে আলাদা তাপ ছড়াচ্ছে।

'খবর'-এর ব্যাপারটা কিছু হওয়া উচিত, যাই বলুন।

কিছু হবে না বুলুবাবু। ডেথ অফ এ ডায়ানোসর। মালিকরা যেভাবে নিজেদের খরচের জন্যে টাকা ড্রেনেজ করিয়েছে অপদার্থ অফিসারদের দিয়ে, তারা খবরের কাগজ তো বোঝেই না। টাকা চুরি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

গভমেণ্ট কোমরে দড়ি দেয় না কেন? প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ই এস আই—কিছু জমা পড়েনি। কর্মীদের দু মাসের মাইনে দু বছরের পুজো বোনাস। আর কিছু না হোক, খুলে আপনাদের বকেয়াগুলো অন্তত—

কে কাকে অ্যারেস্ট করবে! ওপর মহলে সবাই সবাইয়ের বন্ধু। কাঁচা আমের সঙ্গে পুদিনা পাতা বেটে তৈরি শরবতে মেথি ভাজা গুঁড়ো মশলা। তার তলানির শেষটুকু অমৃতলাল ভেতরে নিতে নিতে একটা আরাম টের পাচ্ছিল। শ্বেতপাথরের গ্লাসে বনেদী বাড়ির অ্যারিস্টোক্রেসি। সিগারেটে, ভেতর দিয়ে ধোঁয়া নামিয়ে আনার গরমে, বাইরের তাপে-উত্তাপে এটুকু শরবত শীতলতা আনতে পেরেছিল।

কিন্তু পি এফ জমা না দেয়া তো ক্রিমিনাল অফেন্স।

তাও জানি। কিন্তু ভানুভক্তবাবুদের সব খুন মাফ।

কি কাগজ কী হয়ে গেল! বলতে বলতে বুলু বসাক নতুন নতুন সিগারেটে যেতে পারে।

আপনারা মামলা করছেন না কেন?

সে সব আমি জানি না। বলতে বলতে শরবত খাওয়ার ফাঁকে ডোকরা অ্যাশপটের গায়ে রেখে দেয়া সিগারেটের শেষ কটি টান দেয়ার অংশটুকু তুলে নিল অমৃতলাল।

হরলালকার খবরটা দিলে বলবেন। রবীন্দ্রনাথের স্কেচ—বলতে বলতে অমৃতলাল সিগারেটে ফিরে গেল।

চোখের সামনে দেখলুম মশাই রবীন্দ্রনাথের ছবি আর স্কেচের দাম বাড়তে। এই তো সেদিন, পঁচাত্তর সালের পর থেকে। কালীঘাটের পট যেমন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি। আর তো আঁকা হবে না। স্বাধীনতার আগে ছিল নন্দলাল আর অবনীন্দ্রনাথের দাম। আর রবি বর্মা তো লক্ষ টাকা।

এক লাখ টাকা—রবি বর্মা! অমৃতলাল তার মুখটি বিস্ময় মাখিয়ে তুলে ধরল।

এক লাখ কি মশাই! কখনও তারও বেশি। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রবি বর্মা পুণেতে তৈরি করেছিলেন রবি বর্মা আর্ট প্রেস। সেখান থেকে তাঁর ছবির প্রিন্ট আসত।

কিন্তু রবি বর্মা তো রাজা-মহারাজাদের বাড়ি—অমৃতলাল সিগারেটের ছাইটুকু ডোকরা অ্যাশপটের হাঁ-য়ের ভেতর ঢেলে ফেলল।

তাতে কি! রবীন্দ্রনাথের স্কেচ কিনবে হরলালকা। রবি বর্মা কিনে নেবে সামতানি। আপনি আমি জিনিস জোগাড় করে দেব। ডিল্ পুরো হলে নিজের নিজের কমিশন গুনে নেব। এমন বলতে বলতে বুলু দেখতে পেল অমৃতলালের শরবত শেষ করে ফেলা শ্বেতপাথরের ফাঁকা গ্লাসের কানায় একটি নীলচে মাছি ধীরে এসে বসল।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সবুজ-লাগা অন্ধকারে একা একা হাঁটছিল অমৃতলাল। বিকেলের দিকে অভ্যাসে, মনে

হয় একবার যাই না। দেখি। কাদের এগজিবিশন হচ্ছে। জিনসের ব্যাগির ওপর পাতলা হ্যাণ্ডলুমের ঢিলে পাঞ্জাবি। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। অমৃতলাল একটু মাথা নিচু করেই হাঁটছিল। উল্টো দিকে, ময়দানে কোনো টেক্সটাইল মেলা। অনেক বড় ডিসকাউণ্টের বিজ্ঞাপন। ওপাশে আলো-লাগা রবীন্দ্রসদন, তার সামনের ফোয়ারার জলে, লাল-নীল আলোয় কী এক মায়া। বাতাসে উড়ে আসা জলকণায় বৃষ্টির ছোঁয়া। অনেকেই এই গরমে তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডাটুকু গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছে। উল্টো দিকে ভিক্টোরিয়ার আলো।

অমৃতদা! অমৃতদা! কে যেন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের গাছপালার আড়াল থেকে ডাকল। অমৃতলাল প্রথমটায় শুনতে পায়নি। আজকাল এ রকমই হয় অনেক সময়, ধারাবাহিক আর্থিক-অস্বাচ্ছন্দ্য, অনিশ্চয়তা তাকে কিছু কিছু টেনশনের চাপে কাবু করে দিতে পেরেছে। বড্ড তাড়াতাড়ি যেন বেড়ে যাচ্ছে বয়েস।

অমৃতদা!

অমৃতলাল থমকাল। অন্ধকার থেকে একটি খাদির গাঢ় সবুজ পাঞ্জাবি আর সরু পায়ের শাদা পাজামা সামনে এসে দাঁড়াল। অনেক মনে করেও অমৃতলাল তাকে চিনতে পারল না। গালে আবছা আবছা দাড়ি, খাড়া নাক। ফর্সা মুখ। বেশ লম্বা হাড়-হাড় চেহারা। লাজুক চাউনি—আপনাদের অফিস নাকি আবার খুলছে?

বলতে পারব না ভাই। একটু বিরক্তির সঙ্গেই যেন কথাকটা হাওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে অমৃতলাল নিজের স্মৃতিকে উসকে দিতে চাইছিল।—কোথায়! কোথায় দেখেছি একে? কোনো এগজিবিশনে! আর্ট ফেয়ারে। 'দৈনিক খবর'-এর অফিসে? কিছুতেই ছবিটি স্পষ্ট হচ্ছিল না।

তবে যে কাগজে দেখলাম। প্রধানমন্ত্রী নিজে চেষ্টা করছেন।

বিরোধীপক্ষ খুব চাপ দিয়েছে অ্যাসেমব্লিতে। কেন ভানুভক্ত-বাবুদের অ্যারেস্ট করা হবে না!

আমি কিছু জানি না ভাই। 'দৈনিক খবর' খুলবে কিনা এ একমাত্র বলতে পারবেন ভানুভক্তবাবু। ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলনেতারা।

ইস্! এতদিনের কাগজ! এতগুলো লোকের রুজি-রোজগার। আপনাদের অনেকেই তো 'পর্যবেক্ষণ', 'সংবাদ'-এ চলে গেল। আপনি কোথাও?

আমায় তো কেউ ডাকেনি ভাই। খবরের কাগজে তো না ডাকলে যাওয়া যায় না। আমারও বয়েস হয়েছে। নামে দু-এক জন হলেও চেনে—এ বয়েসে আর—এমনটি ভেবে নিলেও বলা হয়ে ওঠে না অমৃতলালের। সে আজে-মৌজে এভাবে বলতে পারে—ঐ ভাই লিখছি—স্টেটসম্যানে, বোম্বে, দিল্লির কাগজে। ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিনে—বলতে বলতে অমৃতলাল আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে যায়। এভাবে জিজ্ঞাসায় নিজের ভেতরেই অকারণে কিছু অপমান তৈরি হয়ে যায়। ঘরে, বাইরে। সুমিতা যখন আমায় বলে, তুমি তো তেমন কাজের নও, তাহলে তোমায় নিশ্চয়ই ডেকে নিত এতদিনে, নেহাৎ আমার স্কুলমাস্টারিটা—

কিংবা এ রকমও—শান্তনু, আমার তেরো বছরের একমাত্র সন্তানটিকে যখন তার চাহিদামতো ক্রিকেটের ডিউস ব্যাট কিনে দিতে পারি না, তখন একই কথা—অন্যভাবে আসে—বাবা, তুমি অন্য কোনো কাগজে কেন চেষ্টা কর না!

অমৃতলাল দেখতে পেল তার পেছনে আর সবুজ পাঞ্জাবি নেই। গেটের সামনে টিকিট কাউণ্টারের এপাশে-ওপাশে থিয়েটারের পোস্টার—পঞ্চম বৈদিকের 'নাথবতী অনাথবৎ', বহুরূপীর 'কিনু কাহারের থেটার'।

রাস্তা পেরিয়ে ময়দানের ঘাস, গাছ, অন্ধকার পেরিয়ে অমৃত-লালের মনে হলো আজ একবার প্রেস ক্লাবে যাওয়া যেতে পারে।

হে'টে তেমন সময় লাগে না। সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটার প্রেস ক্লাব-তাঁবু ভিড়ে, তামাক-অ্যালকোহলের গন্ধে, কথায় ভারি হয়ে আছে। বাইরে লনে তেমন আলো নেই। গার্ডেন চেয়ার এনে বসে ড্রিংকস নিচ্ছে কেউ কেউ। আরও ওপাশে ময়দানের অন্ধকার। খুব মন খারাপ হলে অমৃতলালের সব এলোমেলো করে দিতে ইচ্ছে করে। 'দৈনিক খবর' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার আর তেমন করে অ্যালকোহলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তবু আকাঙ্ক্ষা থাকে।

ভিড়ে টেবিলে, যেখানে তাসের আয়োজন, কিংবা তার পাশে ফাঁকা টেবিলে শুধুই খবর করার গল্প আর গৌরব করা দু-একজন। তেমন করে অমৃতলালকে কেউ চিনতেই পারল না। ভাঙা নৌকোয় কে আর উঠে বসে?

এক কোণে ড্রিংকস নিয়ে বসেছিল সানু সেন। ইউনিয়ন, আই জে এ, আন্দোলন। দৈনিক খবর-এর ফিল্মের পাতায় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর ছিল সানু।

এই যে ক্রিটিক। সানু ডাকল।

অমৃতলাল কোনো একটি পরিচিত ডাল খুঁজছিল। যেখানে দু দণ্ড বসা যায়। সানুকে দেখে, ডাক শুনে তার মনে হলো বুঝিবা এইখানে বসা যেতে পারে।

কী খবর কি? করছটা কি?

কী আবার! ওই স্টেটসম্যান—দয়া করে যদি ছাপে। আর দু-একটা দিল্লি-বোম্বের কাগজে—

ওদেব পেমেণ্ট তো বেশ ভালোই।

লেখা ছাপা হলে তো।

কর। কর। ফ্রিল্যান্সিং তো মন্দ নয়। কোনো বাধা-বাঁধন নেই। বলতে বলতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার রামের গ্লাসে সানু বড় করে চুমুক দিল।

অমৃতলালের আর বসতে ইচ্ছে করছিল না।

এবার তাকে অবাক করে দিয়ে সানুই জিগ্যেস করল, কবে খুলছে বল তো ?

কি ? অমৃতলাল ঢোক চাপল।

আমাদের অফিস—'দৈনিক খবর' ?

অমৃতলালের চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। তবু তো পতনের আগে মানুষ কিছু একটা ধরে ফেলতে চায়। অমৃতলাল কিছু ধরতেও চাইছিল না। সে তার অফিসের এমপ্লয়েজ ইউনিয়নের নেতার কথায় বিস্মিত হয়েছিল শুধু। জীবন কতরকম হয়। ঝপ করে তামাক, অ্যালকোহলের গন্ধে মাথাটা ধরে গেল। অমৃতলাল বলতে চেয়েছিল, খবর খোলা-না-খোলার ব্যাপারে তো সব জানে ভানুভক্তবাবু, তুমি, পাল্টা ইউনিয়নের সুধীর আর দেশের প্রধানমন্ত্রী। বলা হলো না।

চেয়ার থেকে উঠে পড়ল অমৃতলাল।—যাই।

আ রে বোসো বোসো। এখন তো সবে আটটাও বাজেনি। একটা খাবে নাকি ?

নাহ্, থাক। গরমে ভালো লাগছে না।

লেখার তাড়া আছে ?

নাহ্, তেমন কিছু নয়, তবু বাড়িতে—। ফ্রিল্যান্স আমাদের দেশে যারা করে, দু-একজনকে বাদ দিলে আসলে তো তাদের পেশা উঞ্ছবৃত্তি—একটা গালভরা নামের আড়ালে। যাতে জাতও যায়, পেটও ভরে না। এমনটি বলতে চেয়ে নিজের ভেতর নিজে কথা-গুলো গিলে নিল অমৃত। শত হলেও সানু তাদের নেতা।

একেবারে হেন পেগড হাজব্যান্ড হয়ে গেলে যে—খুব রসিকতা করছে যেন, এমন সুরে একটু হেসে নিয়ে এ সব বলতে বলতে সানু নতুন সিগারেটে চলে যেতে পারে।

কি হবে বল তো আমার ? সানু রামের তলানিতে যেতে চাইছিল। তার ব্যাকব্রাশ-করা ঘন তিন থাক কালো চুলে প্রেস ক্লাবের আলো ডুবে গেছিল।

আট

এস-টি-ডি-তে মীনার গলা আরও রক্ত-মাংসের মনে হয় তিলকের। দেড় মাস তো হবেই, নাকি দু'মাস পর, মীনার এ কণ্ঠ—তিলক ঠিকমতো মনে করতে পারছিল না। তিলকের হাতে সিগারেটের ধোঁয়া ধীরে মিশে যাচ্ছিল ঘরের বাতাসে।

হাই মীনা! কতদিন পর! তিলক যেনবা তার দিল্লিবাসের দিনগুলোতে মীনা চতুর্বেদী আর তার উষ্ণ সাহচর্য মনে করতে পারছিল।

সাগর যাচ্ছে তার ছবি নিয়ে কলকাতায়। তোমায় টেলিগ্রাম করেছে শুনলাম।

পাইনি তো।

তুমি অবশ্যই বিড়লা অ্যাকাডেমির সঙ্গে—

মীনার উচ্চারণে কোথায় যেন বাঙালি রক্ত লুকিয়ে। আসলে ওর মা পেইন্টার সুচরিতা মুখার্জি—

বড় বড় সব কাজ নিয়ে যাচ্ছে সাগর। অয়েল, টেম্পেরা। ওখানে গিয়ে ফ্রেম করাবে। বলতে বলতেই মীনা বোধহয় লাইটার জ্বালাল। টেলিফোনে তার হালকামতো শব্দ ভেসে এলো।

কবে আসছে সাগর?

জুনের এণ্ডে।

এটা কি কোনো এগজিবিশনের সময় মীনা? বর্ষা পড়ে যাবে। শীত ছাড়া কলকাতায় কোনো বড় এগজিবিশন হয়?

ও কে, ও কে। অল রাইট। বাট ইউ লিসন্ ইয়ার—সাগর অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলেছে। ইতনে সারে তসবিরেঁ—

আই নো। আই নো। বট ইউ সি—অচানক ইয়ে সব, জরা সোচো ইয়ার—

তিলক, আই আন্ডারস্ট্যাণ্ড এভরিথিং অ্যাণ্ড আই নো যে, উইন্টার ছাড়া এই ভাঙা সিজনে, বারিষে, কিচড়ে কেউ—নো বডি

উইল পারচেজ, লেকিন সাগর এ'কে ফেলেছে না, ও তো কলকাতা যাবেই। তুই—ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ তিলক। এভরিথিং—ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ। ইটস মাই রিকোয়েস্ট। আই নো। ওনলি, ওনলি তিলক চাউধ্রি ক্যান ডু ইট।

দূরে বৃষ্টি নেমেছে। এ-বাড়ির ভেতর থেকে বৃষ্টির শব্দ টের পাওয়া যায় না। কুকুর তিনটের লোম কয়েকদিন আগেই ছাঁটাই করিয়েছে তিলক। তারা এই অন্ধকারে, কার্পেটের ওপর লম্বা করে শুয়ে, মাটিতে পেট লাগিয়ে হ্যা হ্যা হ্যা করছিল, লম্বা জিভ বের করে। টেলিফোনের ও-প্রান্তে অনেক দূরে রাজধানী থেকে মীনা এস-টি-ডি-র শেষ কথাগুলো বলছিল—লিসন্ ইয়ার। তিলক, সো নাও আই স্যাটিসফায়েড দ্যাট—

ও কে। ও কে। ইয়া।

কথার যোগসূত্র ছিঁড়ে গেল।

তিলকের মনে পড়ল কালই বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একবার চেষ্টা করতে হবে। অর্চনাদিকে একটা ফোন করা দরকার। সাগর ছবির এগজিবিশন করবে। মীনা বলেছে। কার্ড ছাপান, তার ডিজাইন করা। সাগরের ছবির একটি তালিকা, সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা—এ সব নিয়ে একটা ব্রোসিওর। সবই ছেপে ফেলতে হবে এগজিবিশনের আগে। এর পর একটা প্রেস কনফারেন্স। খবরের কাগজের লোকজন, অ্যাড এজেন্সির কয়েকজনকে ডাকা দরকার। স্ন্যাক্স, ড্রিংকস। এরই ফাঁকে পার্ক স্ট্রিটে আমার নতুন গ্যালারি 'সংস্কৃতি'-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গণেশ পাইনকে চেষ্টা করছি। নয়ত পরিতোষ সেন। এই বর্ষাতেই 'সংস্কৃতি' চালু হবে। প্রথম টাঙাব আর্লি বেঙ্গল স্কুল, গ্লাস পেইন্টিং, ফিরকা পেইন্টিং। ছবিও দেখানো হলো নিজের কালেকশান থেকে। কিছু বিক্রিও হলো। গ্লাস পেইন্টিং, অভ্র দিয়ে ফিরকা পেইন্টিং, আর্লি বেঙ্গল স্কুল—সবই তো অ্যান্টিক। বাইরে বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তবুও একলা একলা সরু করিডোরের ওপর

এসে দাঁড়াল তিলক। মাথার ওপর ছাউনির কাচে বৃষ্টির শব্দ। সামনে কাঠ আর কাচের ওপারে হলুদ ভেপার ল্যাম্পের গা দিয়ে বৃষ্টি উড়ে উড়ে পড়ছে। তিলক কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পেছনে অন্ধকার প্যাসেজের ওপর ডগি, রকি, গোল্ডি।

এই ফ্লোরে পাশের ফ্ল্যাটে ঠিক তখনই বিহারের কোনো প্রাক্তন রাজার সরকারমশাই বেহালায় কী যেন একটা গৎ টানলেন। বোধ-হয় ওয়েস্টার্নই হবে। শুনতে শুনতে ভেতর অব্দি কেঁপে উঠল তিলকের। সরকারমশাইটি থাকেন ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারের কাছে। নাম নবীনবরণ মুখোটি।

বৃষ্টিতে আটকে গেছেন নবীনবরণ। আজ আরও একটু রাত বাড়লে এ-পাড়ার কোনো হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে তিনি এ-ঘরের একটিতে থেকে যাবেন। দুটি ঘর পাশাপাশি। একটিতে সেই মোটাসোটা রাজামশাই বা তাঁর ছেলে এসে থাকেন কখনও কখনও। আর একটি ঘরে রাজ্যের জিনিস। তিলক দেখেছে আকাশের দূর-নক্ষত্রটি চেনার জন্যে একটি দূরবীন আছে, লোহার। তার গায়ে মরচে। আর ধুলোমাখা শিংঅলা হরিণের মুণ্ডু। তার চোখে সবুজ কাচের গুলি। এখনকার রাজার বাবার শিকার করা। একটা বাথটাব আছে খটখটে শুকনো। তার গায়ে ফাটার কালচে দাগ। মাকড়সার জাল। ধুলো। গোটাদুই ভাঙা বন্দুক। সেই গাদাবন্দুকের বাঁটে মাদার অফ পার্লের চিকিমিকি। ট্রিগার টানার জায়গাটি, বাঁট ধরার একটি জায়গার দুপাশে রুপোর কারুকাজ। কয়েকটা রুপোর আতর-দান। একটা একটু পারা-চটে-যাওয়া বেলজিয়ান আয়না।

রাজা নিজেই তার সরকারমশাইটিকে সকলের আড়ালে বলেন, মিস্টার শ্লাই ফক্স। হনুর হাড়তোলা সরু মুখে রাজ্যের চালাকি। নাকের নিচে কেয়ারি-করা সরু, ফিনফিনে গোঁফ। মাথার চুল ধবধবে শাদা। সিল্কের ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি। পায়ে

কালো পাম্প। মিনিট তিনেক কথা বলার পরই ভুল ইংরেজিতে চলে যেতে পারে নবীনবরণ।

বেহালার সুর খুব ধীবে ধীরে তিলকেব বুকেব মধ্যে বিঁধে যাচ্ছিল। একটা কান্নার ঘোর বুঝি। খুব গুমরে কেঁদে-ওঠা কেউ। যেমনটি কোনো শোকের দিনে। নবীনবরণ সুরের গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছিল। বাইরে অবিরাম বৃষ্টির পতনধ্বনি তিলককে অস্থির করে তুলছিল।

ঠিক তখনই গোপালনগরের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে একা একা বাড়ি ফিরছিল গোপাল দাস। হাতে কাগজে, তার ওপর শক্ত করে প্লাস্টিক মোড়া খানদুই ডাচ-বেঙ্গল। পার্টি রাজি হয়নি। অনেকখানি ড্যামেজ বলে ফেরত দিয়েছে। এ ছবি সহজে রেস্টোর করাও যাবে না। কলকাতায় রেস্টোরেশানের লোক এখনও তেমন করে তৈরি হলো কই! বৃষ্টি আটকাতে ছাই রঙের টুপির ওপর রুমাল বেঁধেছে গোপাল। পায়ে বাটার জলসা। প্যাণ্ট দু-ফোল্ড গুটিয়ে নিয়েছে। 'ছবির প্যাকেট বুকের কাছে আঁকড়ানো। এ জিনিস নিয়ে আবার চেষ্টা চালাতে হবে। যেমন দালালদের করতে হয়। একটা ট্যাক্সি খানিকটা জল আর কাদা গোপালের প্যাণ্টে ছুঁড়ে দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল।

শালা! তারপর একটি চার অক্ষরের গালাগালি। বিকেলে সামান্য মেঘ জমেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছিল সঙ্গে। তবু এরই মধ্যে যে আকাশ ভেঙে এমন নামবে তা কে জানত! গোপাল বেশ ভিজে গেছে। সঙ্গে ছাতা না নেয়ার জন্যে নিজেকেই নিজে খানিকটা গালাগালি দিল।

হলুদ হ্যালোজেনের গা-আঁচড়ে বৃষ্টি পড়ছিল। ডানদিকে পুরনো ফার্নিচারের বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে খুঁজলে কখনও কখনও পুরনো রেকর্ড, লাল চোঙাঅলা গ্রামোফোন, বিলিতি চিনেমাটির পুতুল, পুরনো বই হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া হয়ে যায়। দোকানিরা প্রায় সবাই মুসলমান। তারা

গোপালকে চেনে, খাতির করে।

আর একটু এগোলেই বাঁদিকে আলিপুর জেলের উঁচু লাল পাঁচিল। উল্টোদিকে সিমেণ্টের ঢালাই পোলের নিচে গঙ্গা। কুমোরের গ্লাস, ভাঁড় তৈরির চাকা। গঙ্গার ওপারে বড়সড় মোষের খাটাল। ইটের গা-বের করা হতকুচ্ছিত দোতলা, কী তিনতলা। তার পায়ের কাছে, সিমেণ্টের ব্রিজের নিচে, ওপরে, খাটালের গায়ে অনেকগুলো মেয়ে। তাদের ঠোঁট খুব লাল। চোখে অনেক কাজল। মুখে সস্তার পাউডার। এই বৃষ্টিতেও তারা ঘরে থাকতে পারে না। বাইরে বেরিয়ে হাসতে হয়। চোখ-ইশারা করতে হয়।

গোপাল আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথের গায়ে ল্যাম্পপোস্টের পাশ দিয়ে সরু গলিপথে সে হেঁটে যাবে, সেখানে দোতলা মাঠকোঠার একতলায় পঁয়ষট্টি টাকা ভাড়ার শ্রীগোপালচন্দ্র দাস। মাটির দেয়াল, ঢেউ-খেলানো টিনের চাল। কাঠের গরাদঅলা জানলা। এ বাড়ি ছেড়ে কতদিন ভদ্রমতো একটা পাড়ায় উঠে যেতে বলেছে তিলক।

ডিল্ তো কম হচ্ছে না দালালবাবু, সঙ্গে ভালো কমিশন। ছেলেটাকে ভালো স্কুলে দিয়েছেন। নিজে একটু ভালো থাকুন। জীবন তো দুদিনের। না, সব টাকা ব্যাঙ্ক অফ জয়নগরে—

আমি কাউকেই বোঝাতে পারি না এই ঘুপচির ভেতর থাকার সুবিধে অনেক। টাকা হয়ত আছে একটু ভালো জায়গায় উঠে যাওয়ার, কিন্তু সেখানে আমার সোর্স অফ ইনকাম কী বলব! অত টাকা বাড়িভাড়া, অ্যাডভান্স। দেখাতে তো হবে, কোথায় পাই, কী করি। জমি-বাড়ির দালালি করে সবসময় তো এত হয় না। অন্যের জন্যে জমি, বাড়ি দেখতে গিয়েও তো কত খবর পাই। তবু ঠিকানা বদলে ওঠা যায় না।

বৃষ্টির ছাঁট গলির মুখের আলোকে মাঝে-মাঝেই কেমন যেন একটু আড়াল করে দিচ্ছিল। গলির মুখের আবছা আঁধারটুকু

পেরিয়ে গেলেই ডানদিকে মাঠকোঠা। সিমেন্ট-বাঁধানো নিচু রাস্তার একপাশে জল জমেছে। মাঠকোঠার কাঠের শিক লাগানো জানলার গা থেকে চলকে আসা আলো নোংরা জলের ভেতর ডুবে যাচ্ছিল। গোপাল টের পাচ্ছিল ভেতরে টিভি চলছে। এই সময়ের ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের সিরিয়ালে যে থিম মিউজিক বেজে ওঠে, তার এক-আধটা টুকরো গোপাল দাসের কানের ভেতর জড়িয়ে যাচ্ছিল। আরও দূরে অন্ধকার গলির গভীর থেকে বিবিধ ভারতীয় কোনো পঞ্চরঙ্গী প্রচার-তরঙ্গ পরিগ্রাহি সুরে এ-গলির বাতাসে মিশে গুলিয়ে উঠছিল।

গোপাল বন্ধ কাঠেব দরজায় শিকল পিটিয়ে পিটিয়ে তার পরিচিত শব্দটি তুলে নিজের বউকে জানিয়ে দিতে পারছিল—ওগো, আমি এসেছি। আমি এসেছি।

গলির ধারের নোংরা জল তার ক্রিম-পালিশকরা 'জলসা'র চামড়া ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

ভেতরে ঢুকে জুতো দেয়ালের গায়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে, ঘরের ভেতর থেকে ছিটকে-আসা টেলিভিশনের আলো দেখতে পেল গোপাল।

নয়

খুব সকালে খবরের কাগজ এসে যায় এ-বাড়িতে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিলক গোটাদুই ইংরেজি কাগজ আর একটা বাংলার হেডিংয়ে যেতে পারে। খুব বড় করে বিজ্ঞাপন কাগজে—গ্যালে, ল্যালিক, অ্যাপস্লে পেলাট, দ্যম, জেমস গাইলস, ওয়েব, রজার এ গ্যালেট, খুব নামি কোম্পানির সেন্টের খালে শিশি চাই। আর চাই মুন ফেজ পকেট ওয়াচ, মোভাডো, ওমেগা, রোলেক্স হাতঘড়ি।

দেখতে দেখতে তিলকের হাই উঠছিল। গোটা ঘরজুড়ে কুকুর কুকুর গন্ধ। এই বর্ষার সকালে বাতাসে তিনটি গোল্ডেন রিট্রিভারের আলগা হয়ে আসা দলা দলা লোম উড়ছিল হাওয়ায়। বর্ষা

পড়লেই এমন হয়। দেয়ালে দু-একটা রক্তচানা এঁটুলি। নখে করে টিপেও মারা যায় না, এত শক্ত। বর্ষায় এরাও বেরিয়ে আসে গা থেকে। প্রফুল্লকে বলতে হবে ওষুধ দিতে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিলকের মনে পড়ল ১৯৫০-এর শুরুতে চুনিলাল নওলাক্ষা শুরু করেছিলেন অ্যান্টিকের ব্যবসা। ততদিনে আইন হয়ে গেছে যে কোনো অ্যান্টিক আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে রেজিস্ট্রি করতে হবে। ফোটো তুলিয়ে রাখতে হবে। আমরা আটকে গেলাম, আইনের প্যাঁচে।

ভাবতে ভাবতে বাসিমুখেই সিগারেট খেতে পারে তিলক। ধাতুর তৈরি জিনিস, পাথরের জিনিস, মিনিয়েচার পেইন্টিং, কালীঘাটের পট, টেক্সটাইলস—সবই আইনের আওতায়। চুনি-বাবুর গুরু ছিলেন গম্ভীর সিং শেঠিয়া—বাড়ি আজিমগঞ্জ। ক্যামাক স্ট্রিটে চুনিবাবুর দোকান 'সরোজ'।

বাবা শশাঙ্কশেখর বুঝি বা তিলকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম—খোকা, তুমি কি জানো—

উপুড় হয়ে বালিশের ওপর বুক এনে তিলক শুনতে পেল, রাজেন মল্লিকের কালেকশান ছিল দেখার মতো। ভালো কালেক-টারদের মধ্যে ছিলেন কমলাপত সিংহানিয়া, বিড়লারা। বি কে বিড়লা পছন্দ করেন ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক। এল এন বিড়লা ভালোবাসেন ইউরোপিয় শিল্পবস্তু। পিলানিতে তাঁর মিউজিয়াম আছে। বি কে বিড়লার মিউজিয়ামটি কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউতে।

তিলকের মনে পড়ল এই তো কয়েকদিন আগে নওয়ালকিশোর মতিবাবু কেজরিওয়াল কিনলেন ফরাসি ডিকেন্টার, চারটি। নন্দলাল কানোরিয়া কেনেন ইউরোপিয়ান আর্ট অবজেক্ট। হনুমন্তপ্রসাদ পোদ্দার কিনে যাচ্ছেন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা। আমি এদের সকলকেই প্রায় জানি আর চিনি। কখনও কখনও কিছু

দিয়েও থাকি।

তিলকের মনে পড়ল বসন্ত চৌধুরীর পার্সোনাল কালেকশানে আছে শাল, জামেওয়ার, মুদ্রা, গণেশ। মোহন বাদোরিয়া, বসু-মল্লিকরা সবাই আমার বাইভ্যাল।

ভাবতে ভাবতে বিছানাব ওপব সোজা হলো তিলক। উঠে বসার আগে তাব মনে পড়ল বিজলী গ্রীলেব মালিক দেবু বারিকের নানান ধবনেব অ্যাণ্টিক কেনাব শখ আছে। নীহার চক্রবর্তীর কালেকশানে বয়েছে বেশ কিছু পুরনো পেইণ্টিং, বিশেষ করে হেমেন মজুমদারেব আঁকা ছবি। এ সবই জানা হয়েছে, নানা ডিলু-এর ভেতব দিয়ে।

বৃষ্টিভেজা সকালে নতুন কবে একদফা ঘুমে যেতে ইচ্ছে করে। বিছানায় আবাবও শুয়ে পড়ে তিলক। হালকামত তন্দ্রা জড়িয়ে এলে দেখতে পায় বোম্বাইয়ের প্রাণলাল ভোগীলাল, সোমানী, টাকসানওয়ালা, ম্যালকম সুকিয়া, ফাকরু—এ'রা সবাই কেউ কালেকটর, কেউবা ডিলার, আমি এ'দের কাউকেই চিনি না। কলকাতার কানি বাঈয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়, সেও তো অনেকদিন হলো। এমন চোখ—জিনিস চেনার কমপিটেন্সি—আমি তো আর দেখিইনি প্রায়।

আমাদেব কাছ থেকে কী কী জিনিস কিনতে চায় সবাই—এমন একটা তালিকা মনে মনে পর পর সাজিয়ে দিতে পারে তিলক।

১। ইংলিশ ব্রোঞ্জ (আর্ট নোভো)
২। ইউরোপিয়ান ব্রোঞ্জ মূর্তি
৩। অ্যালাবাস্টার ফিগার
৪। ইটালির সফট স্টোনের কোনো জিনিস
৫। ইউরোপিয়ান পেইণ্টিং
৬। কালীঘাট পট
৭। ডাচ-বেঙ্গল স্কুলের ছবি
৮। টেগোর স্কুল, ওরিয়েণ্টাল আর্ট

৯। হেভি কাট গ্লাস

১০। ঝাড় (স্যাণ্ডেলিয়ার)

১১। পুরনো আইভরি

১২। চাইনিজ আইভরি ফিগার, এনামেল-করা সোনা বা রুপোর জিনিস

দাদাবাবু, আপনাকে চা দি? ঘরের ভেতর প্রফুল্ল এসে দাঁড়িয়েছে।

নাহ্, এখন নয়। বলতে বলতে শুয়ে শুয়েই নতুন সিগারেট খেতে পারে তিলক। এই একলা ঘরে তার মনে হয়, অনেকগুলো কনুই থেকে কাটা হাতের ভেতর গোছা গোছা একশ টাকার নীল নোট তাকে ঘিরে। নোটেরা উড়ে পড়ছে শীতের ঝরা পাতা হয়ে। —আমাদের চাই ভিকটোরিয়ান বা ফরাসি ফার্নিচার। ইউরোপিয়ান পেইণ্টিং দাও আমাদের। মুছে যাওয়া অন্ধকার মুখে শুধু একটি হলুদ ফোঁটা।—কেয়া ভাও তিলকজি! ডিল্ পাক্কা করুন।

ইসলামিক আর্ট অবজেক্ট চাই, যত টাকা লাগে লাগুক। তিলক তার চারপাশে অনেকটা যেন মকবুল ফিদা হোসেনের আঁকা মুখ-মুছে-যাওয়া ফিগার দেখতে পায় শুধু। শাদা পাগড়ির ওপর কালো দাগ। ঢিলে, শাদা জোব্বা। জোব্বা আর পাগড়ি ঘরের ভেতর নেচে নেচে বলে, যাবতীয় ইসলামিক আর্ট অবজেক্ট দরকার। সব নেব। সব। কবজি-খসে-যাওয়া শাদা জোব্বার ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পেট্রো ডলার উড়ে আসছিল। আর তারা পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছিল এ-ঘরের বাতাসে। তিলক সেই ডানাওয়ালা নোটেদের ধরবার চেষ্টা করছিল আধো-তন্দ্রার ঘোরে। অনেক, অনেক টাকা। তিলক সেইসব পাখি-হয়ে-যাওয়া টাকাদের ধরতে গিয়ে ঘোরের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠছিল।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি, সেই স্বপ্নের ভিকটোরিয়া ওকাম্পোকে কবি হয়ত চুম্বনে—তেমন ছবিটি উড়ে যাচ্ছে ডানা ঝাপটে।

তিলক তা-ও দেখতে পেল। ছবির গা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ছে অনেক, অনেক টাকা। তার পেছনে অনেক অনেক মুখ-মুছে যাওয়া মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা পেইন্টিং উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে।

আর তখনই ডগির মেঘডাকা শব্দে তিলকের ঘুম ছিঁড়ে গেল। প্রফুল্ল ওদের জন্যে কলাইকরা থালায় শুধু হলুদ দিয়ে রাঁধা মাংসের টুকরো আর ঝোল নামিয়ে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে ভাত। ডগি, রকি, গোল্ডি নিজেদের মধ্যে গর্‌গর্‌ করছিল।

ঘড়িতে ঠিক এগারোটা বেজেছে। বাইরে, খুব জোরে বৃষ্টি এলো। তিলক তার কোলবালিশটি আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে।

দশ

নিজের ঘরে, খাটের ওপর শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে পল্টন কালিঘাট পটের ওপর একটি লেখা পড়ছিল। দু-একটা নতুন তথ্য আছে। পার্টিকে কনভিন্স করাতে গেলে এসব ইনফরমেশান জানা দরকার। আর্চার সাহেবকে সবাই মহর্ষি ঠাউরে নিয়েছে অ্যান্টিক অ্যান্ড আর্ট কালেকটররা। কিন্তু তার বাইরেও কথা আছে। পল্টন সেই কথায় একটু একটু করে ঢুকে পড়ছিল।

প্রাক-কথন

'আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের একটি পরিচিত ছবি এরকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নি-বাতাস তখনও পৃথিবীকে ছুঁয়ে যায় নি। কালোবাজারী, মজুতদারী, রেশন, কন্ট্রোল-এর শাড়ি-ধুতি, সাইরেন, অলক্লিয়ার, এ আর পি, ব্ল্যাক আউট ইত্যাদি শব্দরা বাঙালি জীবনকে ধরে আছাড় মারতে পারে নি। টেলিভিশন ভি সি পি, ভি সি আর, টেপ রেকর্ডার তখনও বাঙালি জীবন-ধারায় শুধুই স্বপ্ন।

'অর্ধ শতাব্দী আগের এমনই এক নিস্তরঙ্গ সকালে পূব বাংলার ফরিদপুরের আকসায় গাজির পট নিয়ে আসে পটুয়া। চারদিকে

মাটির দেয়াল, টিনের চালের ঘর। মাঝে উঠোন। সেখানে জড়ানো পট খুলে দেখাতে দেখাতে গান গায় পটুয়া। নানাবিধ কিস্যা—সামাজিক, পৌরাণিক। বাড়ির অন্দরমহল অবাধ বিস্ময়ে সেই চলমান চিত্রমালায়, গানে কোন মায়ায় যায় জড়িয়ে।

'চুল নাই বুড়ি
ক্যাশের (কেশ) লাইগ্যা কান্দে
কচু পাতার ঢিব্বি দিয়া
খোপা বড় করে।'

'পটুয়া গান শেষ করে পট গুটোলে তাকে কিছু দিতে হতো, চাল অথবা অন্য কোনো খাদ্য। নিয়ম বাঁধা ছিল নির্দিষ্ট তারে।

'এমনই অনেক সঙ্গীত, কাহিনী। সেই সব গাজির পট যাঁরা দেখেছেন, গান শুনেছেন, তাঁদের অনেকেই এখন জীবনটুকু হাঁটতে হাঁটতে প্রায় শেষ করে এনেছেন। কেউ বা খেলা শেষে কাচ বাঁধানো ছবি হয়ে ঘরের দেয়ালে।

'তবু স্মৃতি থেকে যায়। হাওয়ায় ভাসে পূর্বজনদের বলে যাওয়া কথা। সেই সব উচ্চারণে বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা যায়—স্মৃতি ফেরানোর খেলায়।

'দুই বাংলা কবেই ভাগ হয়েছে। সেও তো তেতাল্লিশ বছর হলো প্রায়। ফরিদপুরে আজও গাজির পটের গান শোনানো পটুয়ারা ঘুরে বেড়ান কিনা জানা যায় না। তবে এ বাংলায় বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা পট আঁকেন। মেদিনীপুরের 'নয়া'-র পটুয়ারা কলকাতার রাস্তায়, নানা অফিসে কোনো কোনো মেলায় আসেন পট বিক্রির জন্যে।

বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (চতুর্থ খণ্ড)-র ১০২-৩ পাতায় আমাদের জানিয়েছেন 'চিত্রিত পুঁথি এবং অঙ্কিত পট অথবা কাঠের তৈরি পুঁথির মলাট, সমস্তই যান্ত্রিক ছাপাখানার যুগে নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে

এই পট অঙ্কন। 'চিত্রকর' অথবা 'পটিদার' এইসব পট অঙ্কন করতেন এবং অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এঁরা বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর জেলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মোটামুটি ভালোভাবে কাজ করেছেন। শিল্পীরা একটি লম্বা কাপড় নিয়ে, সাধারণত পুরনো কাপড়, তার ওপর গোবর মেশানো কালো মাটির কাই-এর প্রলেপ দিতেন। কাই শুকিয়ে গেলে তার ওপর গালার আস্তরণ দিয়ে কাপড়টিকে শক্ত এবং ছিদ্রহীন করে নেয়া হতো। এই মশলাদার কাপড় চার টুকরো বাঁশের কঞ্চির ফ্রেমে এঁটে নিয়ে তাতে রঙ চড়ানো হতো, আর দেব-দেবী অসুর-পিশাচ পুরুষ-নারীর ছবি এঁকে বর্ণনা করা হতো পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি. দেবদেবীগণের ক্রিয়াকর্ম এবং স্বর্গের সুখ আর নরকের যন্ত্রণার কথা। ভবঘুরে লোক-চিত্রশিল্পীরা এককালে এইসব গোটানো পট বগলদাবা করে ঘুরতেন এবং সহজ সরল গ্রামবাসীদের কাছে গোটানো ছবি ধীরে ধীরে খুলে গানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিতেন। আজকাল 'পটিদার'-গণের কাঁচা হাতে আঁকা এই সমস্ত ছবি গ্রামের জনগণকে আকৃষ্ট করে না। তার কারণ অনেক বেশি বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় অথবা অন্যান্য জাতের ছবি ভ্রাম্যমাণ ছায়াচিত্রের মাধ্যমে গ্রামে-গ্রামে গ্রামের নানাবিধ মেলায় তাদের দেখানো হচ্ছে। এই কারণেই লোকচিত্র শিল্পীগণের অধিকাংশই আজকে পট-অঙ্কন ছেড়ে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন, মিস্ত্রী মজুর আর চাষী হয়ে গেছেন। পরিবর্তিত সামাজিক তরঙ্গ তাঁদের বাধ্য করেছে অন্যান্য লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করতে।'

শ্যামসুন্দরের ঘর সংসার

'শ্যামসুন্দর চিত্রকর, গ্রাম নয়া, জেলা মেদিনীপুর,—বয়েস পঞ্চাশের কম। ধারাবাহিক দারিদ্র্য তাঁকে বয়েসের তুলনায় বেশি বুড়ো করে ফেলেছে। মুখে বসন্তের দাগ, মাথাজোড়া টাক, চোখে

চশমা। শ্যামসুন্দর কলকাতায় বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিকের অফিস, ম্যাক্সমুলার ভবন, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, গুরুসদয় মিউজিয়ম করে বেড়ান তাঁর কাঁধ-ঝোলা বোঝাই পট নিয়ে। খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে কলকাতা, তারপর বাস-ট্রাম, হাঁটাহাঁটি। রোজ যে পট বিক্রি হয় তা নয়, তখন কোনো স্টেশনে রাতের বেলা মুড়ি খেয়ে, নয়তো খালি পেটে শুধুই জল। সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান বা জেলা সভাধিপতির দেয়া সার্টিফিকেট—ইনি চিত্রকর, যা পুলিশী ঝামেলার হাত থেকে বাঁচায়। আর মুখে সেই আবহমানের গৌরব মেশানো বাক্যমালা—'আমরা শিল্পী।'

'শ্যামসুন্দরের স্ত্রী রানী চিত্রকরও পট আঁকেন। ওঁদের একটিই কন্যা। সামান্য চাষবাস, গোরু, হাঁস-মুরগি—এসব আছে। তাতে দিন চলে না। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে পট দেখানো, পট আঁকার ওয়ার্কশপে কাজ পাচ্ছেন শ্যামসুন্দর বা এরকম কেউ কেউ। খাওয়া-দাওয়া। সামান্য কিছু টাকা। বৃক্ষরোপণ, পণপ্রথা, বধূ হত্যা—এসব নিয়ে সামাজিক পট। শহরের নানা মেলাতেও কিছু কিছু পট বিক্রি হচ্ছে। পঞ্চাশ, আশি এমন কি দুশো একশোও। বাবু-বিবিরা ঘর সাজান। তবে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্যে তাঁরা জড়ানো পটের থেকেও বেশি পছন্দ করেন আড়া-পট।

'ইদানীং বিদেশি সংগ্রাহক এবং গবেষকদের নজর পড়েছে মেদিনীপুরের পটচিত্রের ওপর। কোরিয়ার মেয়ে কিম বহুদিন ধরে থেকেছেন শ্যামসুন্দরের বাড়ি। তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছেন পটুয়াদের লৌকিক-জীবনের নানান উপাদান। শ্যামসুন্দর আমাদের জানান, এসব নিয়ে কিম একটা বই লিখবে।

'শ্যামসুন্দর কলকাতায় এসে রাত্রিবাসের সূত্রে আমার বাড়িতে আসেন। সেখানে দীর্ঘ কথোপকথনের সূত্রে জানতে পারি তাঁর দৈনন্দিন বেঁচে থাকা আর দুঃখের বারোমাস্যা।

'চিত্রকররা এক বিশেষ ধর্মাবলম্বী। এঁদের প্রত্যেকেরই একটি

হিন্দু এবং একটি মুসলমানী নাম, এমন কি ভোটার লিস্টেও তাই। যেমন আবেদ আলি—আনন্দ। ইসমাইল—বনমালী। জুম্মন—গুরুপদ। ওসমান—দুখুশ্যাম, বৃহস্পতি। জবেত—বিষ্ণুপদ।

'মেয়েদের নামও এরকম ভাবেই—জৈগুন—কাজল। খাতুন—লক্ষ্মী। ছেলে হলে মায়েব নামের প্রথম অক্ষব দিয়ে তাব নাম হবে। মেয়ে হলে বাবার নামে প্রথম অক্ষব দিয়ে। তাই শ্যাম-সুন্দরের মেয়ের নাম সুষমা।

'চিত্রকরের ঘর সাধাবণভাবে অপরিছন্ন। মেয়েরা গোরু, হাঁস-মুরগি পালে। আবার 'মনিহাবি জিনিস'—দেশলাই, বিড়ি, আলতা, সিঁদুর, চুড়ি নিয়ে দূর দূর গ্রামে ফিরি করে। ৩ মাস, ৫ মাস, ৭ মাস এবং ৯ মাসে গর্ভবতী নারীর সাধ হয়। প্রথমে শ্বশুরবাড়ি, তারপর বাপের বাড়িতে এই অনুষ্ঠান। পায়েস, সুজি, পুর পিঠা, গুড় পিঠা খাওয়ানো হয় এইসব উৎসবে।

'ছেলে হলে ৬ দিনে নামকরণ হয়—ষেঁটরা পুজোর দিন। মেয়ে হলে ৭ দিনে। বাতাসা, সন্দেশ, চিড়ে, বই-শ্লেট, পেনসিল দিয়ে পুজো। যিনি প্রসব করলেন তিনি রাতে ভাত খাবেন শোল মাছের মাথা আর মোরগের মাথা দিয়ে।

'চিত্রকরের সকালের মুল-খাবার পান্তাভাত। এক পাকা, দো পাকা, তিন পাকা—এক মুখো, দু মুখো, তিন মুখো উনোনে রান্না করে তার নারী। পটুয়া শহরে ঝোলা বোঝাই পট নিয়ে বিক্রি করতে না এলে গ্রামে যায় পট দেখাতে। দুরে দুরে। বাড়ি বাড়ি। মুসলমান বাড়িতে মুসলমানী-পট, সাঁওতাল পাড়ায় সাঁওতাল-পট। আবার হিন্দু বাড়িতে পৌরাণিক কাহিনীর পটচিত্র, সামাজিক পটও।

'সেখানে পটুয়া চাল পায়, খুচরো পয়সা, জলখাবার মুড়ি। হয়ত ছেঁড়া কাপড়ও। নবীন গেরস্থ বৌটি এসে আহ্লাদী গলায় বলে, ও পটিদার পট দেখাও। গান করো। বিয়ে বাড়িতেও ডাক

পড়ে কখনও কখনও।

'হালফিল এসবে ভাটার টান। গ্রামে গ্রামে ভি-ডি-ও তাঁবু। সেখানে রঙিন ভায়োলেন্স ও যৌনতায় শরীর অন্য উত্তেজনা পায়। ফলে পট হারে। পটুয়া পিছু হটে। তার অনাহারের দিনগুলি, রাতগুলি দীর্ঘায়িত হয়। বৃত্তি বদল করে কুলি হয়ে যাওয়া, চাষবাসে ফেরা বা ভ্যান রিকশা চালানোর কথা ভাবেন অনেকেই।

'চিত্রকর বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার চর্চা প্রায় নেই। যে কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতেই এ'রা বিনা নেমন্তন্নে যান। সেখানে আহার জোটে, হয়ত কিছু অপমানও।

'শ্যামসুন্দর আব নয়াগ্রামের প্রায় পঁচিশ ঘর পটুয়া যে পট আঁকেন সেগুলি এরকম—মনসা পট, কৃষ্ণলীলা, শ্রীমন্ত মশান (চণ্ডীমঙ্গল), সাবিত্রী-সত্যবান, দাতাকর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, জগন্নাথ, সীতাহরণ, রাবণ বধ, দুর্গার শঙ্খ বর্ণনা, মনোহর ফাঁসুড়িয়া।

আছে অন্য পট, পিলচুবুড়ি, পিলচু হড়াম আর সেই অলৌকিক হাঁস নিয়ে আঁকা সাঁতালি পট। আছে স্বাধীনতা দিবস, আধুনিক নারীর সিনেমা যাওয়া, ৭৮-এর বন্যায় হেলিকপটারে ওড়া মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সেই পট দেখানোর সময় শ্যামসুন্দর গান,—

'কোথা ওগো জ্যোতি বসু
গরীবের ভগবান'

'পণপ্রথা, বধূহত্যা, বৃক্ষ রোপণের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের ছবিও এ'কে ফেলেন চিত্রকরেরা। মনসামঙ্গলের সেই করুণ কাহিনী শ্যামসুন্দর পট দেখাতে দেখাতে অতি সহজেই এভাবে গেয়ে উঠতে পারেন—

'বাঁশের গজালে মেরে বেহুলা ভাসিল
ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা কত দুখ পেল
হেনকালে সীমন্তিনী ছয় ভাই এল

ভাই বলে ওগো দিদি প্রাণের ভগিনী
পচা মড়া লয়ে দিদি জলে ভাস তুমি
মা বাপের ঘরে দাদা আর নাইক সাজে
কঁদলা ছ ভাজের সঙ্গে সদাই দণ্ড বাজে
ঘরকে ফিরে চল দিদি আমরা সেবা নেব
ছটি বধূ তোমার নীচেতে খাটাইব।'

'আবার পাশাপাশি 'বৃক্ষরোপণ'-এর মতো আধুনিক, সামাজিক পট দেখাতে দেখাতে শ্যামসুন্দর গেয়ে উঠতে পারেন—

'জনগণ, সবাই মিলে করো গাছ রোপণ
গাছ লাগাইলে পরে পুকুরেতে মাছ বাড়ে…
দেশ-বিদেশের বাগান হলে
বাগানে উপকার মেলে
রান্না করে খেতে হলে
কাঠের প্রয়োজন…
ও জনগণ…'

'সস্তা—একটু মোটা কাগজে নয়ার শ্যামসুন্দররা পট আঁকেন। রং বলতে সবই আরথ্ কালার। চাল ভাজা হাঁড়ির কালি দিয়ে কালো, শিমপাতা বাটা দিয়ে সবুজ, ঘুঁটের ছাই দিয়ে ধূসর কালো, কাঁচা হলুদ দিয়ে হলুদ, পাকা পুঁইয়ের বীজটি দিয়ে গোলাপি। এদের সবার সঙ্গেই মিশিয়ে নেয়া হয় বেলের আঠা —রং পাকা থাকার জন্যে। তুলি তৈরি হয় ছাগলের ঘাড় থেকে কেটে নেয়া লোম সরু কাঠির মাথায় বেঁধে।

'এভাবেই দুঃখের বারোমাস্যা চলতে থাকে শ্যামসুন্দরদের। বন্যা, মৃত্যু, রাজনৈতিক পালাবদল আর নবজাতকজাতিকার আগমনে। যাই ঘটুক না কেন, জীবনের অচলায়তনে কোনো পরিবর্তন আসে না।

'নয়ার জড়ানো পট, বীরভূমের যম পটের সঙ্গে কালিঘাটের ঘোষ পরিবারের যাঁরা শিল্পী, তাঁদের কোনোভাবেই একসূত্রে বাঁধা যাবে না। এই পরিবারেরই বিজয় ঘোষ, বয়েস ৪৫-৪৬, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন আর কালিঘাটের পটের ব্যাপারে নানা খোঁজ-খবর রাখেন।

'বিজয়বাবু থাকেন কালিঘাটের ১৬/১, দেবনারায়ণ মুখার্জি রোডে। ওঁর ঠাকুর্দা ছিলেন স্বনামধন্য নিবারণ পটুয়া। রবীন্দ্রনাথ একবার কথাপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, পট জানতে হলে নিবারণ পটুয়ার কাছে যাও। নন্দলাল বসু, ও, সি, গাঙ্গুলী এসেছেন নিবারণবাবুর কাছে।

'বিজয়বাবুর কাকা কানাইলাল ঘোষ ছিলেন এ পরিবারের শেষ পটশিল্পী। আর্চারের বইতে ওঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে। ৬৯-এ কানাইবাবু মারা যান। বিজয়বাবুর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি প্রায় আড়াইশো বছর আগে এই পরিবারের ঊর্ধ্বতন পুরুষ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ পট আঁকতেন। তাঁর দুই ছেলে নিবারণ ঘোষ ও কালিচরণ ঘোষ। নিবারণবাবু মারা গেছেন ১৯৩০ সালে ৯৫ বছর বয়েসে—ইঁদুরের কামড়ে। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কালিচরণ ঘোষ মারা যান ৯৭ বছরে। কালিচরণবাবু এবং নিবারণবাবু—দু'জনেই অসামান্য পট আঁকতেন।

'কালিচরণবাবুর দুই ছেলে বলরাম ঘোষ, কানাইলাল ঘোষ। এঁরা পটও আঁকতেন। শোলার কাজও করতেন। বলরামবাবুর দুই ছেলে—বিজয় ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। বিজয়বাবুর পিসিমা কুমুদিনী ঘোষও অসম্ভব ভালো পট আঁকতেন।

'ষোলো বাই পনের ডিমাই কাগজ—যার রং অনেকটা গুড়ের বাতাসার মতন তার ওপর জল রঙে—সবই দিশি রং—ভুষো কালি, গোলেলা, পেউড়ি, আলতানুটি—

'টাকির জমিদার সমরেন্দ্রনাথ রায়সরকার কালিঘাটের পোটো-

পাড়ার অর্ধেকটির মালিক ছিলেন। এখনকার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, গঙ্গার সামনে তাঁদের জমিদারি সেরেস্তা ছিল। এঁদের প্রজা ছিলেন কালিচরণবাবু, নিবারণবাবু। সমরেন্দ্রবাবুর বাড়ির প্রতিমা ডাকের সাজে সাজানোর গুণে তাঁদের খাজনা মকুব হয়ে যায়—ডাকের সাজ তৈরি করতেন কানাইলাল ঘোষ, বলরাম ঘোষ। বলরামবাবু মারা যান ১৯৭৬ সালে।

'বহু বছর আগে কালিঘাটের নকুলেশ্বরতলায় চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা বসত। সেখানে এক পয়সা দু পয়সায় পট বিক্রি হতো—এমন তথ্য আমাদের দেন বিজয়বাবু। মাহেশের রথের মেলা, ইছাপুর, নবাবগঞ্জের ঝুলনের মেলা, রাসবিহারীর রথের মেলা, টালিগঞ্জের রাসের মেলায় বিক্রি হতো পটুয়ার আঁকা পট।

'মুসলমানদের বিয়ের সময় ফানুসের সঙ্গে পট বেঁধে ছাড়ারও রেওয়াজ ছিল। বিজয়বাবুর কাছে শুনেছি ওঁর ঠাকুর্দা কালিচরণ ঘোষের আঁকা যে কাকটি গুরুসদয় মিউজিয়ামে আছে, সেটি নাকি পান খেতে খেতে হঠাৎই এঁকে ফেলেন কালিচরণবাবু।

'বিজয়বাবু বলেন, কালিঘাটের পটের বিশেষত্ব তার নাম না জানা শিল্পীরা—এরকম একটা তথ্য যে বাজারে প্রচলিত আছে, তা সত্য নয়। পরাণ বৈরাগী, নীলমণি দাস, বলরাম দাস, বটকৃষ্ণ পাল, বলাই বৈরাগী—এরকম বহু শিল্পী ছিলেন কালিঘাটে।

'বিজয়বাবুদের বাড়িতে ওঁর পূর্বপুরুষ মাটির দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে ছবি এঁকে গেছেন। তাঁদের স্টুডিও ছিল না। আঁকার সময় চারপাশে ভিড় করে থাকত সাধারণ মানুষ। বিদেশিরা তাড়া তাড়া পট কিনে নিয়ে গেছেন এখান থেকে। আর্চার সাহেব তো এসেছেনই এ বাড়িতে। আর এসেছেন হুমায়ুন কবীর, স্টেলা ক্রামরিশকে সঙ্গে নিয়ে।

'বিজয়বাবুর মতে, কালিঘাটের পট শেষ হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাপকভাবে লিথোগ্রাফ, উডকাট আর ছাপাই ছবিতে বাজার ছেয়ে যাওয়া। একসঙ্গে বেশি বেশি উৎপাদন, রঙের জৌলুস—এ সবই

কালিঘাট পটকে হারিয়ে দিল। পটুয়ারা অনেকেই বৃত্তি বদল করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মূর্তি তৈরিতে। পটুয়া শিক্ষক আর রইলেন না। রাতারাতি জীবনের বদল হলো। পরাণ বৈরাগী চলে গেলেন রেঙ্গুন। পোটো পাড়ায় অবশ্য বলরাম দাসের বংশধররা আছেন।

'বিজয়বাবুর কথায় আমরা টাইম মেশিনে না বসেই কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ফিরে যেতে পেরেছিলাম সেই-কলকাতায়। যখন কলকাতার অনেকটাই পুকুর, জলা, জঙ্গল। রেড়ির তেলের সেজ বা কেরোসিনের আলো জেবলে রাতে পট আঁকা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় টানা ট্রাম। ইংরেজ সবে এদেশে জাঁকিয়ে বসেছে। সায়েবরা আর বাবু-বিবি হয়ে উঠেছে কালিঘাট পটের বিষয়। আর তার সঙ্গে নানা সামাজিক কেচ্ছাও। সম্পূর্ণ নাগরিক এই সোসাল স্যাটায়ারের ডকুমেণ্টেশন আর কোথাও আছে কি ?

কালিঘাট পটের কয়েকজন সংগ্রাহক

'১৯১৭ সালের ৮ আগস্ট রুডইয়ার্ড কিপলিং ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামকে উপহার দিলেন তাঁর বাবা জে লকউড কিপলিংয়ের সংগ্রহ করা একগাদা জলরঙে আঁকা হিন্দু দেবদেবীর ছবি, লকউড সাহেব স্কুল অফ আর্ট-এর প্রিন্সিপ্যাল থাকার সময়ে।

'এই ছবিগুলো কালিঘাটের অখ্যাত পটুয়াদের আঁকা। শিল্প-বোদ্ধারা মনে করলেন অজন্তা আর বাঘ শৈলীর কাছাকাছি এই ছবিগুলি রঙে রেখায় আধুনিক চিত্রকলারও আত্মীয় হয়ে উঠেছে। ১৯২৬-এর অক্টোবরে আর্ট জার্নাল 'রূপম'-এ অজিত ঘোষ লিখলেন কালিঘাট পটের বিষয়ে।

'উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগে দেখা গেল কালিঘাট-এর পট। জল-রঙের ব্যবহার করতেন শিল্পীরা, ছবি আঁকার কৌশলে, বিষয় নির্বাচনে বৃটিশ প্রভাব তো ছিলই। কালিঘাটে

তীর্থ করতে আসা মানুষজনের কাছে বিক্রির জন্যে পটুয়ারা আঁকতেন কালি, শিব-পার্বতী, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাম-সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, ব্রহ্মা, সরস্বতী। এছাড়া ভাগবত, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে আঁকা হতো ছবি। পরে অনেক সামাজিক-সমস্যা, সোস্যাল স্যাটায়ারও ঢুকে পড়ে ছবিতে। 'এলোকেশী মোহন্ত' নিয়ে এরকম বহু ছবি আঁকা হয়েছে :

'ডব্লু. জি. আর্চার তাঁর কালিঘাট পেইন্টিংস-এ লিখেছেন, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, কালিচরণ ঘোষ—এই যে বিখ্যাত দুই পটুয়া—সম্পর্কে এঁরা দুই ভাই—এসেছিলেন ২৪ পরগণা থেকে। অন্যান্য বিখ্যাত পটুয়ারা ছিলেন নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস, বলাই বৈরাগী, পবান।

'কালিঘাট পটের শেষ পর্ব ১৮৮৫-১৯৩০। ১৮৭০-১৮৯০—এই সময়ে কলকাতায় 'নব্য বাবু কালচার'-এর উত্থান চোখে পড়ে। এই 'উঠতি বাবু'-দের নানা কেচ্ছা-কাণ্ডও কালিঘাটের পটুয়ারা আঁকাব বিষয় কবে নেন।

'১৮২০-তে কলকাতায় লিথোগ্রাফিক প্রেস এলো। ডয়েলি ১৮২৮-এ পাটনায় বসান বিহার লিথোগ্রাফি। তিনি জয়রাম দাস নামে পাটনার এক শিল্পীকে এব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার জন্যে নেন।

'লিথোর প্রভাব অবশ্যই পটচিত্রকে বেকায়দায় ফেলে। ১৮৪০-১৮৬০—এই সময়ের লিথোয় ছাপা আউটলাইনে শিল্পীরা রং দিয়ে ভরাট করতেন।

'কলকাতায় কালিঘাটের পর সংগ্রাহক যে ক'জন আছেন, তাঁদের মধ্যে লেডি রানু মুখোপাধ্যায়, বাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), জে পি কানোরিয়া, বিখ্যাত শিল্পপতি গোয়েঙ্কাদের কেউ কেউ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে পড়েন।

'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের নাতি সুভ-গেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সুভো ঠাকুর) ছিলেন কালিঘাট পটের একজন

বড় সংগ্রাহক। তাঁর ছেলে সিদ্ধার্থ ঠাকুরও এব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। সিদ্ধার্থবাবু নিজে শিল্পবস্তু সংগ্রাহক। কালিঘাট পট ছাড়াও বহু বিচিত্র ধরনের আর্ট অবজেক্ট তাঁর সংগ্রহে আছে।

'সিদ্ধার্থবাবু আমাদের জানান, কালিঘাট পট এখন প্রায় বেয়ার সামগ্রী হয়ে গেছে। একসময় পাঁচ পয়সা ছ পয়সায় পটুয়ারা যে পট বিক্রি করেছেন, তার দাম এখন ৩০,০০০ টাকা। তাও অরিজিন্যাল পাওয়া মুশকিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে অন্ধ্র-ওড়িশার সীমান্তে মান্দাসা বলে একটি জায়গা থেকে সুভো ঠাকুর অন্তত শ দেড়েক কালিঘাট পট সংগ্রহ করে আনেন। ৩০-৩৫ টাকার মতো দাম পড়েছিল এক একটির। কলকাতার কালিঘাট থেকে মান্দাসা রাজ্যে কেমন করে গেল পট···এরকম একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে।

'সিদ্ধার্থবাবু সুভোবাবুর কাছে শুনেছেন, যেসব তীর্থযাত্রীরা কালিঘাটে কালিপ্রতিমা দর্শন করতে আসতেন, তাঁরা পটুয়াদের দিয়ে তাঁদের ভাষাতেই নামটিও লিখিয়ে নিতেন। এইসব পটের ওপর তেলুগুতে নাম লেখা ছিল।

'জনাইতে ফোক আর্টের ওপব যে বিশাল মিউজিয়াম গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল সুভোবাবুর, তার জন্য তিনি বোম্বেতে একটি এগজিবিশন করেন। বম্বেতে সেই এগজিবিশন থেকে বেশ কয়েকটি কালিঘাটের পট বিক্রি হয়েছিল। তা ডিলারদের হাত ঘুরে যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ডের মিউজিয়ামে চলে যায়।

'আর্চার কালিঘাট পট-এর ওপর বই লেখার বিদেশে এর কদর অসম্ভব বেড়ে যায়। ফরাসি শিল্পীরা অনেক এর থেকে প্রভাবিত হয়েছেন বলে সিদ্ধার্থ ঠাকুর মনে করেন।

'তাঁর মতে কালিঘাটের পট সর্ব অর্থেই নাগরিক। 'ফোক' কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে এর এত চাহিদার কারণ রেখার বলিষ্ঠতা, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দলিলচিত্র হিসেবেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। উডকাট প্রিণ্ট, লিথো, অলিওগ্রাফ

কালিঘাট পটকে শেষ করে দেয়। এখনও অবশ্য শ্রীশ পাল কালিঘাট ঘরানায় কিছু কিছু ছবি আঁকেন। তবে মূল ছবির সঙ্গে—সেই সময়ের আঁকার সঙ্গে তাঁর ফারাক অনেকখানি।

'কলকাতার গুরুসদয় মিউজিয়াম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ভারতীয় যাদুঘর কালিঘাটের পট সংগ্রহ করেছেন। সুভো ঠাকুরের সংগ্রহে আছে শুধু তামাক খাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কালিঘাটের পট। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৭৮-৭৯-তে সুভোবাবুর সংগ্রহ থেকেই কয়েকটি পট নিয়ে যায়।

'কালিঘাট পটের থ্রি ডায়মেনশানাল ব্যাপারটি নিয়ে সিদ্ধার্থবাবু খুব ভাবছেন। তিনি পট থেকে 'এলোকেশী মোহন্ত'-এর ব্যাপারটি মূর্তি করিয়েছেন।

'রাধাপ্রসাদ গুপ্ত একজন প্রখ্যাত শিল্প সংগ্রাহক, শিল্পবোদ্ধা। এ বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ও লেখালেখিও যথেষ্ট। কালিঘাট পটের আপাত সারল্য, রং এবং রেখা আর পি গুপ্তকে বারে বারে মুগ্ধ করে। তাঁর মতে এইসব পটে ফোক এলিমেণ্ট যে একেবারেই নেই, তা বলতে পারব না। তবে আরবান অ্যাপিল যথেষ্ট পরিমাণেই ধরা পড়ে। কালিঘাটের পট রিয়ালিস্টিক ছিল না, তার মধ্যে যথেষ্ট অ্যাবস্ট্রাকশান ছিল। এই অ্যাবস্ট্রাকশানেই যত মজা।

'রঙিন লিথোগ্রাফ, উডকাট, কালিঘাট পটের একচেটে বাজার নষ্ট করে দেয়। শিল্পীরা স্বাভাবিকভাবেই নতুন মাধ্যমের দিকে ঝোঁকেন। এর কোয়ালিটিও খারাপ হতে থাকে। যে পটুয়ারা বাইরে থেকে এসে কালিঘাটে ছবি আঁকার জন্যে ঘর বসিয়েছিলেন, তাঁরা অন্য প্রফেশান—ঠাকুর, পুতুল ইত্যাদি তৈরিতে চলে যান। কাগজের ওপর ওয়েস্টার্ন টেকনিকে—জল রঙে, গুয়াশ বা টেম্পেরায় তাঁরা যে অনবদ্য সব চিত্রমালা এঁকে গেছেন, তার কোনো তুলনাই হয় না।'

'বীরভূমের শান্তিনিকেতনের কলাভবনে, অজিতকুমার ঘোষের সংগ্রহে, অজিতকুমার মুখার্জির সংগ্রহশালায়, বিড়লা আর্ট কলেজে, বিজয় ঘোষের সংগ্রহে কালিঘাট পট আছে। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে, এছাড়া আরও অনেক বিদেশি সংগ্রহশালায় কালিঘাট পট নিজের রঙে, রেখায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, এক বিশেষ সময়ের দলিলচিত্র বুকে ধরে।'

লেখা দুটির সঙ্গে আছে বিজয় ঘোষমশাইয়ের একটি ছোট লেখা। এই বিজয়বাবু সেই কালিঘাটের বিখ্যাত নিবারণ পটুয়ার বংশধর। লেখাটি এ জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে সাহেবদের বলা, লেখা অনেক ভুলভাল তথ্য বিজয়বাবু সংশোধনের চেষ্টা করেছেন তাঁর মতো করে। পল্টন পড়তে আরম্ভ করল।

'অশাক মিত্র তাঁর 'ভারতের চিত্রকলা' গ্রন্থে লিখেছেন—'কালিঘাটের পটুয়ার মনিব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল না। তাদের মনিব ছিল সাধারণ বাঙালি সমাজ, এই বলিষ্ঠ ও জড়তাহীন অঙ্কন শিল্প বর্ণনা করতে সমসাময়িক একজন বিদেশি কলা-সমালোচক ডব্লু জি আর্চার বলেছেন, 'পিরিয়ড-৪ ১৮৮৫—১৯৩০…দি ফিনিশড পিকচার অন এ লার্জ ফ্লোরিড স্কেল এমপ্লয়িং ব্রড ওয়াশেস অফ কালার, সুইপিং ব্ল্যাক কার্ভস অ্যাণ্ড লিটল শেডিং, কালিঘাট, ১৯০০' আর্চার এবং অন্যান্যদের আলোচনা ও গবেষণায় কালিঘাটের পট ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ঘটনা, এখানকার পটের নিজস্বতাও আজ সর্বস্বীকৃত। কালিঘাটের পটকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার মূলে ছিল কিপ্‌লিঙ আর তার পরেই আর্চার।

'অথচ এত বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তাঁদের সাজ-সরঞ্জাম ছিল অতি আটপৌরে। এই ছবি আঁকায় এঁরা ভুষোকালি, বেগুনী, সবুজ

পেউড়ি, কাঠপেন্সিল ব্যবহার করতেন। কালিঘাটেরই স্বল্প মূল্যের দোকান থেকে ১৬ পনে ডিমাই কাগজে প্রথমে উড-পেন্সিলের স্কেচ এঁকে তার উপর কালির রেখা টানতেন এবং পরে বিভিন্ন রঙ দিয়ে ভরাট করতেন। এই কালির রেখা এমন বলিষ্ঠ-ভাবে ও সহজ হাতে টানা হতো যে, তুলি কোথায় কাগজ স্পর্শ করেছে বা কাগজ ছেড়েছে বোঝা যেত না। পটের বিষয়বস্তু যেমন সাধারণ ও সাদাসিধে, তেমনই প্রকাশ ভঙ্গিমায় গ্রাম্য সাধারণের সহজ কথা বলার মতোইএকটা বলিষ্ঠ সরলভাবে রয়েছে। চরিত্রগত আকৃতি আর বিষয় গড়ন কখনও বিকৃত হয়নি। ছবির পটভূমির কাজ করেছে। ছবিতে পার্সপেক্টিভ সৃষ্টি, দূর বা কাছাকাছি দেখাবার চেষ্টা নেই।

'অথচ সেকালের মাটির দাওয়ায় বসে স্বভাব রসিক পটুয়ারা যা আঁকিতেন তা তখনকার রাজপুত, মুঘল চিত্র বা চীনা ছবির পাশে সগৌরবে নিজের আসন করে নিতে পেরেছে। সমসাময়িক শিল্পপত্রিকা 'রূপম'-এ ১৯২৬ সালে তাই কালিঘাটের পট সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তাতে অত্যুক্তি কিছুই নেই। 'দি শো সাচ অ্যান অ্যামেজিং মাস্টারি অফ ফর্ম অ্যাণ্ড পেস্ ইউনাইটেড টু মাচ পারফেক্ট টেকনিক দ্যাট ইট লিভস্' ইত্যাদি ইত্যাদি—এই চিত্র-রাশিকে বিষয়ানুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, পৌরাণিক, প্রতিকৃতিমূলক, শ্লেষাত্মক আর বাঙালি জীবনের নথিমূলক। ধর্ম এবং পৌরাণিক ঘরানার পট বামন অবতারে বলিদান, নরসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের ওপর অত্যাচার দমনে বিষ্ণু নরসিংহ অবতার হয়ে হিরণ্যকশিপুর পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি গলায় পরেছেন। প্রতিকৃতিমূলক চিত্রে শিবপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি ছবি ভক্তিভাব স্নিগ্ধ। বাঙালিজীবনের নথি ও গল্পমূলক চিত্রে মালিনী ফুল শুঁকিয়ে রাজার ছেলেকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। এর অনুবাদ দেয়া হয়েছেকোনো কোনো'বইতে 'দ্য শিপ হাজব্যাণ্ড'। আবার এক মোহন্তের বিচারের দৃশ্য খুব বিখ্যাত পট হিসেবে

সমাদৃত হয়েছিল।

'জি ওয়াইলড-এর সংগ্রহ-১৯৩০ এই ঘটনাটি সমসাময়িক এক তারকেশ্বর যাত্রীর স্ত্রীকে নিয়ে। যাত্রীটি তাঁর স্ত্রীকে মোহন্তের কাছে রেখে যান। কিন্তু মোহন্তের কথামত কাজ না করায় মোহন্ত তাঁকে বঁটি দিয়ে দু' টুকরো করে। ছবিতে ইংরাজ বিচার দরবারে মোহন্ত কাঠগড়ায়, স্ত্রী-দ্বিখণ্ডিত, বঁটিটি পড়ে আছে, স্বামীও দাঁড়িয়ে আছে। এই মামলায় মোহন্তের সাজা হয়। সেটিও একটি ক্রমিক পটচিত্রে আঁকা হয়েছিল। শ্লেষাতক চিত্রের মধ্যে —'গোঁফ খেজুরে' বলে বাংলায় যে প্রবাদ ঘরে ঘরে আলস্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তারই সুন্দর চিত্রণ আছে একটি ছবিতে। একটি অতি কুঁড়ে ভদ্রলোকের শায়িত অবস্থার গোঁফে একটি খেজুর পড়েছে। একটি স্ত্রীলোক সেই পথে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক তাঁকে খেজুরটি মুখের মধ্যে ফেলে দিতে অনুরোধ করলে স্ত্রীলোকটিও পা দিয়ে তাই করছে। কোনো বইতে এই ছবির ভুল নামকরণ হয়েছে। 'ওম্যান ট্রামপলিং অন হার লাভার' হিসাবে। আর একটি ছবিতে আছে, এক মালা জপা বৃদ্ধ তাঁর মাথায় একটি শালিক পাখি বসেছে। কিন্তু বৃদ্ধ এতই অথর্ব যে, সেটিকে তাড়ানোরও তার ক্ষমতায় নেই। এটি তৎকালীন একটি রসপ্রবাদ অনুযায়ী অঙ্কিত—সেটি হলো—'বুড়োর মাথায় শালিক নাচে, আর কি বুড়োর বয়েস আছে।' কোনো বইয়ে এর ভুল নামকরণ হয়েছে। 'দ্য মেডিক্যাণ্ট উইথ ক্রো' এইভাবে বিভিন্নভাবের ও বিষয়ের ছবি এঁকে শিল্পীরাঅত্যন্ত সচেতন শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিবারণ ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষ ছাড়া পটশিল্পী আরও হিসাবে কয়েকজনের নাম শোনা যায়—তাঁদেরও কিছু পরিচয় না দিলে, এই আদি শিল্পগোষ্ঠীর পরিচয় অপূর্ণ থেকে যাবে। এঁরা হলেন, বলাই বৈরাগী(দাস), বটকৃষ্ণ,মথুর, পরানচন্দ্র দাস ও দুঃখীরাম। বলাই জাতিতে বৈষ্ণব, কালিঘাটেই বাস। পটশিল্প এর নিজের খুব উৎসাহ ছিল। পরে ইনি নবদ্বীপে

চলে যান। বটকৃষ্ণ বাস করতেন চেতলায়, ইনিও স্বাধীন পটশিল্পী ছিলেন। আনুমানিক ১৯শ শতকের শেষ দিকে মারা যান। পরান দাস, নিবারণ ঘোষ ও কালিচরণ ঘোষের কাছে কিছুদিন পটচর্চা করেন, তাঁরই বাড়ির লাগোয় একটি দোকানে পট বিক্রি করতেন—এছাড়া দুঃখীরামের ইতিহাস বিশেষভাবে জানা না গেলেও, পটশিল্পী হিসাবে তখনকাব দিনে এঁর খ্যাতি ছিল। এছাড়া আরও তিনজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম তখনকার দিনে খুব শোনা যেত। এঁরা হলেন নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস। কালিঘাটের সর্বশেষ পটশিল্পী কালীচরণ ঘোষের পুত্র কানাইলাল ঘোষ। তিনিও ১৯৬৯ সনে মারা যান।

'কালিঘাটের পট সংগ্রহে জি ওয়াইলড-এর ১৯০০-১৯৩০-এ সংগ্রহ, রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর ১৯১৭ সালের সংগ্রহ, সার বিল্লিমাস-এর ১৮৬০-১৮৮৩ সালের আর বাংলার তদানীন্তন লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি জন এরুইন-এর ১৮৭০-৮৫ সালের সংগ্রহগুলিই বিশেষ বিখ্যাত। এর বেশির ভাগই নিবারণ ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আঁকা। ইংল্যাণ্ডের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম-এর শিল্পদূত ডব্লু. জি. আরচার তাঁর কালিঘাট পটশিল্পের অনুসন্ধানে বলেছেন, কালিঘাট পেইণ্টারস অন দি আদার হ্যাণ্ড ওয়ার বেঙ্গলি হিন্দু। উই নো ফ্রম ওরাল ট্র্যাডিশান দ্যাট টু মোস্ট প্রমিনেণ্ট ইন দ্য সেকেণ্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ওয়ার দ্য ব্রাদার্স—নিবারণ চন্দ্র ঘোষ অ্যাণ্ড কালীচরণ ঘোষ অফ হুম ডায়েড ইন ১৯৩০. এজেড ওভার এইটটি।

'আর্চার সাহেবের তথ্যটি ভুল। নিবারণ ঘোষ মারা যান ৯৭ বছর বয়সে ও তাঁর ছোট ভাই কালীচরণ ঘোষ মারা যান ৯৫ বৎসর বয়সে। এঁদের আয়ু কম দেখালে আর্চার সাহেবের লাভ এটাই—কালিঘাট পটের জন্ম সময়টাকে সামনের দিকে এগিয়ে আনা যায়।

'নিবারণ ঘোষের 'জটায়ু ও রাবণের যুদ্ধ'টি অক্সফোর্ড

মিউজিয়ামে এখনও সযত্নে রাখা আছে। মনোজ ঠাকুর লিখিত ১৯৫৯-এর দেশ পত্রিকায় ২৮ আষাঢ় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে অশীতিপর বৃদ্ধ সুদক্ষ পটুয়া নিবারণ ঘোষের বন্ধু হিসেবে- নন্দলাল বসু, অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চক্রবর্তী, মুকুল দে, প্রখ্যাত চিত্র সমালোচক স্টেলা ক্রামরিশের নাম আছে।'

সংস্কৃতি' আর্ট গ্যালারির ফিতে কাটাটি বিকেলের দিকে। গণেশ পাইন, শান্ত, সুভদ্র এই বড় মাপের শিল্পী ফিতে কেটেই চলে গেছেন।

শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে কালো ফাটলের দাগ। বড় থাম। তার পেছনে হালকা রঙের প্লাস্টিকপেইন্টিংয়ের ওপর আর্লি বেঙ্গল, গ্লাস পেইন্টিং, ফিরকার কাজ। প্রেস কনফারেন্সের নামে আড্ডাটি হচ্ছিল ঘুরে ঘুরে। বিকেলের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, সফ্‌ট আর হার্ড—দুরকম ড্রিংকসই ঘুরছিল গ্লাসে গ্লাসে। দেয়ালে আর্লি বেঙ্গলের একটি ওয়ান ডায়মেনশন ছবি। চিনসুরা স্কুলের ছবির সামনে তিলক দাঁড়িয়েছিল।

নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে আঁকা মহাভারতের কুরুক্ষেত্র। কুরু সৈন্যরা সবাই বৃটিশ লাল পল্টনের পোশাকে। সৈন্য সমাবেশের পেছনে যে আবছামতন দুর্গের আভাস, সেখানে মধ্যযুগীয় ইউরোপের আর্কিটেকচার।

শরশয্যায় শুয়ে আছেন ভীষ্ম। তাঁর তৃষ্ণার জলটুকুর আয়োজনে এ যুদ্ধের ক্ষণবিরতি। তিলক দেখছিল আর অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভীষ্মের মাথায় গ্রিকেদের মতো শিরস্ত্রাণ। ভীম আর দুর্যোধনের বর্মে, গদার ডিজাইনে ইউরোপিয় নাইটরা বুঝি উঠে এসেছে। নিজের কালেকশানের ছবি খুব মন দিয়ে দেখছিল তিলক। তার পাশে অমৃতলাল।

গোটা ব্যাপারটায় কেমন ইউরোপিয়ান ইনফ্লুয়েন্স দেখেছেন!

অমৃতলাল তিলক চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হতে চাইছিল। আসলে হাতে কাগজ না থাকলে এসব আসরে খুব বেশি পাত্তা পাওয়া যায় না। এমনটি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিল অমৃতলাল।

তবুও তিলক তার খুবই সামান্য পরিচয়ের এই মানুষটির দিকে তাকিয়ে এক ধরনের প্রফেশনাল হাসি হাসতে পারল। তার মনে হলো অমৃত বোধহয় আরও একটু ড্রিংকসের জন্যে এসব করছে।—আপনাকে কি রাম দেবে? ওলড্ মংক! তিলক জিজ্ঞাসায় গেল।

অমৃতলাল নিঃশব্দে হাসল। যার সাদা অর্থ দাঁড়ায়—আপত্তি নেই।

এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল গোপাল দাস। একপাশে চেয়ারের ওপর বসা পল্টন দত্ত, খুব কমবয়েসী, জিনস পরা, কোনো ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিককে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় বোঝাচ্ছিল।

ভূমেন রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, মোহন ঘোষাল, নীতিশ মুখার্জি—সবই পল্টন দত্তের বলার গুণে এ-ঘরে নেমে এসেছিল। তার সঙ্গে কলকাতার বড় বড় বাড়ির সব বাতিক-এর গল্প। বাবুদের বাতিক। এই ধরো না, এক বাবু রোজ খাওয়ার পর তার খাস চাকরকে দিয়ে ঢেকুর গোনাতেন। ঢেউ ঢেউ ঢেউ করে উনতিরিশটা হওয়ার পর বিরতি। চাকর যখনই বলত, ব্যস—থেমে যেত। সে কোনো দিন সাতাশেও ব্যস বলত। কোনো দিন তিরিশে। কিন্তু বাবুর ধারণা, তিনি উনতিরিশটাই তুললেন।

আর একবাবু রোজ বিকেলে তাঁর গাড়িতে ময়দানে হাওয়া খেতে যেতেন। নিজের বড় রেসিংকার। বিদেশি খেতাব-টেতাবও আছে। রাজাগজা মানুষ। ময়দানের একটি নির্দিষ্ট গাছের নিচে নিয়মিত পেচ্ছাপ করা চাই। বাবামশাই নাকি করতেন। সঙ্গের 'হিলম্যান' গাড়িটিতে মোসায়েবরা, বয়স্য, বন্ধুরা। তাঁরাও

গাড়ি থেকে নেমে এসে নির্দিষ্ট গাছতলায় বাবুমশাইয়ের মূত্রত্যাগ দেখতেন।

বলতে বলতে পল্টন ঘাড় নিচু করে ঘং শব্দে কাশল। তারপর আবার কথার পিঠে কথা জুড়ে ফিরে এলো—মনে আছে, বুঝলে সেই তো গিয়েছি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে সকালবেলা, ওঁর বাড়িতে। হঠাৎ দেখি উনি ডি এল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত পড়ছেন। ঐ একটি মানুষ বুঝলে, যাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনে হতো—কি ঠিক বলছি তো! পরের কথাটা আগে থেকেই সাজিয়ে রাখতে চাইতাম।

আপনি চন্দ্রগুপ্ত—পল্টন দত্ত শিশির ভাদুড়ীর সামনে সহজ হতে চাইছিল।

তুমি কাগজ পড় না? শিশিরবাবুর স্পষ্ট উত্তর।

যাঃ বাবা! এর সঙ্গে কাগজ পড়ার কী সম্পর্ক! পল্টন তল পাচ্ছিল না।—না মানে—

তুমি দ্যাখোনি, কমবিনেশান নাইটে কাত্যায়ন নরেশ। তাই বইটা একটু দেখে নিচ্ছি।

তবে যাই বল, শুধু নরেশ মিত্র কেন, বড়বাবু ভয় পেতেন বিশ্বনাথকেও। নিজের ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীকে। হয়ত বা জেলাস ছিলেন তাঁর অভিনয় প্রতিভায়। আর তাঁর শ্রীরঙ্গমের টিকিট বিক্রির টাকা তো ভাইয়েরা মুঠো ভরে নিয়ে যেত। ক্যাশিয়ারবাবু খুচরো পয়সার হিসেব রাখতেন এভাবে—মেজবাবু—দুই মুঠা (বড় এক মুঠা)···ছোটবাবু—ছোট এক মুঠা। তারাকুমার, বিশ্বনাথ, শিশির ভাদুড়ী—তিন ভাইকে নিয়ে এমন স্মৃতির খেলা খেলতে খেলতে পল্টন সিগারেট খেতে চাইল। সেই ব্লু বার্ড। মাথা নিচু করে খস করে ধরিয়ে নেয়া দেশলাইয়ে, তারপর একটা টান দিয়ে ঘং শব্দে কাশি। মাথাটি অনেকটাই নেমে এলো বুকের কাছে।

ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আমাকে একটা সিগ্রেট—ম্যানিকিওর

করা নখ পল্টনের বুকের অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছিল।

এটা খুব হার্ড। গলায় লাগবে। পল্টন একটু যেন ইতঃস্তত করছিল।

ওটা কোনো ম্যাটার নয়। আপনি দিন। বলতে বলতে সেই সুদর্শনা সিগারেটে যেতে পারে।

পল্টন ততক্ষণে আবার নিজের ভেতর ফিরে এসেছে।—যাই বল, ভূমেন রায়ের কার্ভালো যারা দেখেছে, তারা ভুলতে পারবে না। আর মহেন্দ্র গুপ্ত—এই তো সেদিন মারা গেলেন। শিশির-যুগেব শেষ বড় অভিনেতা, তোমরা তো তাঁব কোনো অভিনয়ই দেখনি। বলতে বলতে পল্টন তার সিগাবেটের ছাই নিজের অভ্যেসমতোই ঘবের কার্পেটে ঝেড়ে ফেলতে পারল।

আর শিশিরবাবু যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন, তা তোমরা প্রেজেণ্ট জেনারেশন, কাণ্ট ইমাজিন। কল্পনা করতে পার না। শম্ভু মিত্রমশাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের লেখায়—শ্রদ্ধার্ঘে, বড়বাবুর কিছু কিছু মূল্যায়ন করেছেন। না হলে অতবড় ন্যাশনালিস্ট, যে 'আমার সুভাষ' ছাড়া কথা বলত না—এমনকি রাজা গোপালাচারীর সভাতেও—তাঁর সেই বক্তৃতা—পল্টনের গলা বুজে আসছিল।

গ্লাস পেইণ্টিংয়ের সামনে—দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যাটি, তারা—এভাবে দশমহাবিদ্যার সবাই আছে, দেখতে দেখতে গোপাল দাসের মনে হলো সামতানিকে বেচলে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। নতুন টাকা করে যা পাচ্ছে তাই কিনছে। কত বছর আগে করা গ্লাস পেইণ্টিংয়ে টিউবের আলো লেগে যাচ্ছিল। দশমহাবিদ্যার দশটি মূর্তি পর পর সাজানো। তার পাশে সরস্বতী, দুর্গা, গণেশ।

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল বেশ কয়েকটা। তার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা আর ফ্লোরোসেন্টের আলো একই সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই মহিলা রিপোর্টারটি প্রেস হ্যাণ্ড আউট আর নোটস গুছিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে পল্টনকে বলল, ধর্মতলা অব্দি একটা লিফ্‌ট আপনাকে

দিতে পারি। আমার অফিসের গাড়ি আছে।

তোমার কোনো অসুবিধে—

না, না। অন ওয়ে, ও তো অফিস যাওয়ার পথেই।

পল্টন রাজি হয়ে গেল।

হরলালকা অমৃতলালের সঙ্গে সঙ্গে তিলক চৌধুরীর সামনে গিয়ে ঠিক তখনই দাঁড়াল। দশমহাবিদ্যার সেটটি তার পছন্দ। এখনই অ্যাডভান্স করতে চাইছে।

তিলক বলল, এগজিবিশন জুলাইয়ের ফার্স্ট উইক অব্দি। আমি আজ কোনো কথা বলব না। আপনি পরে টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসুন। এই আমার নাম্বার। বলতে বলতে সে নিজের ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল।

হরলালকা অমৃতলালের দিকে তাকাল।—এই গোটা সেটটাই আমি কিনব।

অমৃতলাল চোখের কোণ দিয়ে তিলক চৌধুরীকে দেখছিল। অনেকটা দূরে একলা গোপাল দাস নতুন করে ড্রিংকস ভরে নিয়ে আসা বেয়ারার ট্রে থেকে একটা গ্লাস তুলে নিল। তার আশেপাশে তখন চিয়ার্স করার কেউ নেই।

আমি যাই তিলক। বাই অমৃতলাল। পল্টন দত্ত যাওয়ার আগে এভাবেই নড্ করে নিতে পারে। বাইরে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

বুলুর মনে পড়ছিল এই গরমে শান্তিনিকেতনে সদ্য ঘুরে আসার স্মৃতি। আম্রকুঞ্জ, গৌরপ্রাঙ্গণের ধূলিধূসরিত আকাশ। গাছের পাতায় পাতায় খোয়াইয়ের লাল ধুলো। পূর্ব পল্লী গেস্ট হাউস-এর বাইরে বসার সিমেন্ট বাঁধানো জায়গাটিতে ঠেস দিয়ে বসলেই গ্রীষ্মের কুরচি-গন্ধ। কাঠগোলাপের ঘ্রাণ। দূরে দূরে সাইকেলে ছেলে-মেয়েরা, মাস্টারমশাইরা, যাচ্ছেন, আসছেন। মাথায় তাল-পাতার বড় টোকা। এই তো মার্টিন কেম্পসেন—জার্মানি থেকে আসা ছিপছিপে ফর্সা মানুষটি চলে গেল সাইকেলে। মার্টিন,

মার্টিন বলে ডাক দিলেই লাজুক হাসি। রবীন্দ্রনাথের ওপর কাজ করছে। মাথায় তাল পাতায় বোনা টোকা।

বিশ্বভারতী লাইব্রেরির পরোপকারী স্বপন ঘোষ। বন্ধুবৎসল। লাইব্রেরিতে এসে কার কি উপকার করা যায়, ভেবে নিতে চাইছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে। ফোন করছে। স্বপন আবার সাংবাদিকও। নিজে 'উদীচি' বলে একটা দারুণ সিরিয়াস কাগজ করে। মোহরদির ওপর 'উদীচি'-র একটি বিশেষ সংখ্যা নিয়ে স্বপন ভাবছে।

কলকাতা থেকে সাউণ্ড উইং-এর আলো কুণ্ডু গেছে শান্তিনিকেতনে, স্বপন একপায়ে হাজির। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তুষার তালুকদার, নিমাইসাধন বসু, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—কে না স্বপনকে ভালোবাসে! স্বপন তার ব্যবহারে সকলকে ঋণী করে রেখেছে।

পূর্বপল্লী গেস্ট হাউস থেকে আর একটু এগিয়ে গেলেই উঁচু পাড়। তার নিচে রেল লাইন। বাঁ দিকে কোপাই, প্রান্তিক স্টেশন। ডাইনে বোলপুর। লাইন ধরে একটু এগোলেই পূর্বপল্লীতে ভূদেব চৌধুরীর বাড়ি। রাস্তার পাশে বেঁটে বেঁটে টগর গাছ, সেখানে এখন অনেক শাদা শাদা ফুল।

উত্তরায়ণ বাড়িতে পর পর শ্যামলী, পুনশ্চ, কোনার্ক, উদীচি, উদয়ন। একটু দূরে গৌরপ্রাঙ্গণ। ভুবনডাঙার বিশাল মাঠ। তারপর একটু দূরে গেলে নিচু বাংলা। তার আগে বীরদার 'ভালোমন্দ'। সস্তায় সুন্দর খাবার। কথাবার্তায় পাঞ্জাবের মানুষ বীরদা পুরোপুরি বাঙালি। স্বপনই আমার সঙ্গে বীরদার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমরা খেলাম একদিন 'ভালোমন্দ'-তে। খালি খাবারের অর্ডারটা একটু আগে দিয়ে আসা। দামেও সস্তা বেশ।

শান্তিনিকেতনে গেলেই 'সুবর্ণরেখা'য় ইন্দ্রনাথ মজুমদারের বইয়ের দোকানে আড্ডা হবে। ইন্দ্র, ওর ভাই বিমল। শান্তিনিকেতনে এঙ্গেলস-এর নাতনির বাড়িটিতে আছে ইন্দ্র। কলকাতা

থেকে কেউ যেতে চাইলেন বলবে, কোনো ব্যাপার নয়। খালি একটা রামের পাঁইট নিয়ে এসো। ব্যস। ওখানেই দেখা হয়ে যাবে ওর ভাই বিমল মজুমদারের সঙ্গে, আর্টিস্ট।

কমলকুমার মজুমদারের এক নম্বর গুণগ্রাহী ইন্দ্র হয়ত বা গল্পে গল্পে বলবে ঢাকা থেকে স্টিমারে চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা। জাহাজে—জল ভেঙে। স্টিমারে স্কচ আর বোনলেস স্মোকড হিলশা—ওহো, তার যা স্বাদ—বলতে বলতে ইন্দ্র ওর খাদির হাফ পাঞ্জাবির হাতায় মুখের ঘাম মুছে নেবে। তখনই হয়ত তার দোকানে 'এক্ষণ'-এর 'মার্কস' বা 'দান্তে' সংখ্যা খোঁজা কোনো একজন। ইন্দ্র তাকে হেলপ করবে। 'বইয়ের যাদুঘর' বলে দাবি করা 'সুবর্ণরেখা'-র মালিককে তখন চেনা যাবে। এ দেশে এখনও একটা ভালো বুক শপ হলো না—যেখানে ঢালাও বই দেখার সুযোগ—মাঝে মাঝেই এমন বলে ইন্দ্র। বুলু মনে করতে পারে। ইন্দ্রনাথ যে কীভাবে এত প্রাণশক্তি পায়!

'উদীচির' সামনে বনপুলক গাছটি এখনও তেমনই। তার সবুজ পুরু পাতায় গ্রীষ্মের লাল ধুলো 'উদয়ন' বাড়ির সামনে অফিস ঘরে ব্যস্ততা। আলুদা আছেন। রথীবাবুর লাগানো নানান গাছে তখন সূর্যের আলো। গোলাপ তখনও ফুটছে, গাছে গাছে। রবীন্দ্রনাথের থেমে থাকা বন্দি মোটর গাড়ি, খাঁচায় থাকা পেলি-ক্যান—সবাই এ গরমে একটু একটু করে তেতে উঠছে।

'উত্তরায়ণ' বাড়িতে মোরামের ওপর পড়ে থাকা ইউক্যালিপটাস পাতা কুড়িয়ে হাতের পাতায় নিলে আশ্চর্য সুগন্ধ। বুলু মনে করতে চাইছিল।

প্রতি বুধবার ভোরে ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মমন্দিরের কাচের ডিজাইনে সূর্যের সাত রং। সেখানে ধুতি-পাঞ্জাবি বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা আশ্রমিকরা। শাদা শাড়ি পরা মেয়েরা। গান হচ্ছে। বুলু শুনতে পাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে পুরনো আশ্রমিক জ্ঞান পাণ্ডের সঙ্গে হঠাৎই

দেখা। একটা পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। পূর্বপল্লী গেস্ট হাউস-এ নিয়ে গেলেন। ওখানেই উঠেছেন। খাদির ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জ্ঞান পাণ্ডে। জ্ঞানদা বলছিলেন, সেই ক-অ-বে তিনি আর তাঁর এক বন্ধু কোপাই নদীর উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মঙ্গোপার্ক, মার্কো পোলো বা লিভিংস্টোন হবেন, এমন বাসনা। ধোপারা এসেছিল তাদের কাচা কাপড় হস্টেলে পৌঁছে দিতে, তাদেরই গাধা দুটি নিয়ে। গাধার পিঠে নিজেদের গায়ে দেয়ার কম্বল ভাঁজ করে রাখা। দুটি গাধার পিঠে ভাঁজ করা দুটি কম্বল। হাতে বাঁশের কঞ্চি।

হস্টেলে হই হই। মাস্টারমশাইরা গলা মেলালেন, দুজন ছাত্র নেই, দুটি কম্বল, দুটি গাধাও নিরুদ্দেশ। খোঁজ খোঁজ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ক্লাস ফাইভের দুজন ছাত্র অন্ধকার নেমে আসা ঝোপের কাছে খিদে, উত্তেজনায় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছাড়া গাধারা ঘাস খাচ্ছিল।

লাঠি, হেরিকেন, টর্চ, সিনিয়ার ছাত্র, মাস্টারমশাইরা পৌঁছে গেছেন ততক্ষণে। প্রায় ঘুমন্ত দুটি ছাত্র আর গাধা দুটিকে নিয়ে ফিরে আসা। শান্তিনিকেতনে তখন বেশ রাত। অন্ধকারে অনেক জোনাকি।

জ্ঞান পাণ্ডে বলতে বলতে হাসছিলেন। বুলু শুনছিল। মাঝে চা দিয়ে গেছে গেস্ট হাউস-এর অনন্ত। লেবু চিপে দেয়া কালো চায়ে চুমুক দিয়ে জ্ঞান পাণ্ডে বলছিলেন, সেই সেবার ডি· এল রায়ের 'শাজাহান' নাটক হবে। স্টেজ, আর্ট ডিরেকশান সব কিংকরদার। যমুনার এফেক্ট আনতে এক রাতে হঠাৎ কিংকরদা মধ্যপ্রদেশ থেকে পড়তে আসা গণপতের মশারি ছিঁড়ে নিলেন। তার টুকরো হাতে নিয়ে কি উল্লাস কিংকরদার! ছেঁড়া মশারির নানা

ভাগে ওয়াটার কালার লাগালেন। সে রাতেই কলাভবনে গিয়ে আনতে হয়েছিল রামকিংকর বেইজের পছন্দ মতো ওয়াটার কালার। তিনি যমুনা নদী তৈরি করবেন। আগ্রা দুর্গে বন্দী শাজাহানের যমুনা নদী।

পরদিন, কি তারপর দিন এখন আর ঠিক করে মনে নেই, কুড়ি গজ মশারির কাপড় এসেছিল বোলপুর থেকে, কিংকরদার কথা মতো। স্টেজে দুলে উঠবে, ফুলে উঠবে যমুনা নদী। নাটকের শাজাহানের যমুনা।

বলতে বলতে জ্ঞান পাণ্ডে তাঁর দাড়ি-গোঁফ কামানো শামলা গালে হাত দিচ্ছিলেন। মাথায় পাতলা হয়ে আসা পাকা চুলে হাত দিচ্ছিলেন। বুলু বসাক মনে মনে হিসেব করছিল কিংকর-দার দুটো ছোট কাজ আছে একজনের কাছে। ওয়াটার কালার। নিয়ে মাউন্টিং করে বিক্রি করে দিতে পারলেই অনেক টাকা। পার্টি রেডি আছে। কিংকরদা ছাড়াও তার কাছে নাকি বিনোদদা —বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গোটা চারেক স্কেচ আছে। সব মিলিয়ে এ যাত্রা ডিল্ ভালোই হবে। আহা! যদি নন্দলাল পাওয়া যেত! আর রবীন্দ্রনাথ! তাহলে আরও টাকা।

বুলুকে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছিলেন জ্ঞান। বললেন, কোথায় যাবে?

মাথার ওপর বেলা বারোটার রোদ। পূর্ব পল্লীর উঠোন থেকে কুরচি-গন্ধ ভেসে আসছিল।

বুলু বলল, আমি রতনকুঠী গেস্ট হাউসে উঠেছি। বিকেলে রামপুরহাট চলে যাব।

করছ কি এখন? ছবি আঁকছ?

নাহ্, সে আর হলো কই—বুলু তার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড় মানুষটির চোখের দিকে না তাকিয়েই বড় করে শ্বাস নিল। এখন ছবি কেনাবেচা করি। বলতে বলতে পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের বসার জায়গাটি থেকে বুলু উঠে দাঁড়াল।

নিজের সেরেস্তা-ঘরের সামনে বুলু বসাক হাতপাখা হাতে পায়চারি করছিল। ফাইন আদ্দিরের শাদা হাফ-পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে লেপ্টে গেছে গায়ের সঙ্গে। বুলু হঠাৎই বুকের ওপর ঝুলে-থাকা পরম-গুরুমহারাজের লকেট এনে কপালে ঠেকাল। আর তখনই তার আবারও মনে পড়ে গেল অরুন্ধতীকে। শান্তি-নিকেতন, রামপুরহাটের ক্ষণ-সুখস্মৃতি।

বেলেপাথরে বাঁধান উঠোন পেরিয়ে ধীরে হেঁটে আসছিল অমৃতলাল। বুলু তাকে দেখে সেরেস্তা-ঘরের শেকল খুলে ভেতরে এনে বসাল।

কী ব্যাপার? কাল কি-রকম হলো 'সংস্কৃতি' আর্ট গ্যালারি?

বুলু কী বলতে চাইছে বোঝার জন্যে অমৃতলাল সোজা তাকাল। বুলুর কপালে পরিষ্কার তিনটে ভাঁজ—যা কিনা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ফুটে উঠেছে।

ভালো। খুব সংক্ষেপে সারল অমৃতলাল।

গ্যালারি! শিল্প-প্রেম! বাবার এত কষ্টের কালেকশান, সব ঐ তিলক বেচবে। তার জন্যে এত রকম কায়দা। শশাঙ্ক-শেখরবাবু কী কষ্ট করে সব কালেক্ট করেছেন। খেয়ে-না-খেয়ে কেনা যাকে বলে। সব বেচে দেবে তিলক। কাল তো হরলালকাও গেছিল। তা হলো গ্লাস পেইন্টিংয়ের দশ-মহাবিদ্যা গস্ত!

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল অমৃতলাল। সে তার সামনে একজন প্রফেশনাল জেলাসকে দেখতে পাচ্ছিল।—বেচুক বেচুক। কায়দা করে, গ্যালারি, প্রেস কনফারেন্স, শিল্প-সংস্কৃতি। গোটা ব্যাপারটাই এখন মার্কেটিং অমৃতবাবু।

উঠোনে কাইজার এ-বাড়ির ছায়ায়, দাঁড়ের ওপর ডানা মুড়ে বসেছিল। তার পায়ে শেকল। আকাশে এখন অনেক মেঘ। বাতাসে ভ্যাপসা গুমোট। হয়ত এখনই বৃষ্টি আসবে। এরই

মধ্যে থামওয়ালা টানা বারান্দা দিয়ে বুলু বসাকের বড়জ্যাঠামশাই তুষার বসাককে হেঁটে যেতে দেখল অমৃতলাল। তার মনে পড়ল বছর আড়াই আগে একবার খুব ক্যাজুয়ালি সে তুষার বসাককে জিগ্যেস করেছিল, জ্যাঠামশাই, আপনি বদরি, চুনিয়া-মুনিয়া পোষেন না?

খুব বিবক্ত হয়ে কপাল কুঁচকে তুষার বসাক জবাব দিয়েছিলেন, কলকাতাব কোনো বনেদী ভদ্রলোক বদরি বা চুনিয়া-মুনিয়া পোষে না।

নিন, সিগারেট খান—বলতে বলতে অমৃতকে তামাকে যেতে উদ্বুদ্ধ করল বুলু। সিগারেট নিতে নিতে অমৃত দেখতে পেল এক আকাশ মেঘ কালো করে ঘিরে আসছে মাথার ওপর। ঝড়-বৃষ্টি নামার আগেই বসাকআলয়-এর মাথায় নিজের পোষা পায়রাদের নামিয়ে আনতে চাইছিলেন অনাদি বসাক। তাঁর তীক্ষ্ন শিস মেঘের গায়ে বিঁধে যাচ্ছিল বুঝি।

লাইট তো আর এখন আসবে না—বলতে বলতে বুলু বড় চৌকির ওপর ছড়িয়ে রাখা তাকিয়ায় নিজেকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। হাতে সিগাবেট নিয়ে চেয়ারে বসা অমৃতলাল শুধু শুধু ঘেমে যাচ্ছিল।

এগারো

দিল্লি থেকে আজ সকালেই মীনা আর সাগর এসে পেঁছেছে। তাদের সঙ্গের ভি আই পি, লোহার বড় ট্রাঙ্ক বোঝাই ক্যানভাসে আঁকা ছবি। সাগর তো বয়েসে তিলকেরই মতো। বরং মীনা তাদের দুজনের থেকেই বছব চার-পাঁচেক বড়।

সকালে ট্রেন থেকে নামা মীনাব জিনসে, হালকা সুতির পাঞ্জাবিতে হয়ত চব্বিশ ঘণ্টার বা কিছু আগের, তার বাড়ির পমেরিয়ান বাঁচটির গন্ধ লেগেছিল। ডগি, রকি, গোল্ডি—তারা

তিন জনই এই গন্ধটি পেয়ে মীনাকে ছাড়তে চাইছিল না।
এমনকি সামনের দুপা দিয়ে মীনার জিন্‌স-মোড়া পা জড়িয়ে
তারা হয়ত বা কোনো স্বপ্নে যেতে পেরেছিল, ঘ্রাণে।

মীনা তাদের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বকে দিতে পারে
—ইউ নটি—

মীনার সঙ্গে ডগি, রকির আলাপ পুরনো। দিল্লিতে তার
চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়িতে তিলক এদের দুজনকেই নিয়ে গেছে।
সেখানে সাগর-মীনার বিবাহহীন দাম্পত্যে আরও একটি শাদা
লোমওয়ালা কুকুরী। যে এই দুই ভীমকান্তি গোল্ডেন রিট্রি-
ভারকে দেখে প্রায় ইঁদুর হয়ে খাটের নিচে লুকোয়।

ডগি, রকিকে দিনরাত চেনে বেঁধে রাখা ছাড়া তিলকের কোনো
উপায় থাকে না।

নাথিং টু ওরি ইয়ার। বিড়লা অ্যাকাডেমি না হলে আমি
আমার 'সংস্কৃতি'তে তোর এগজিবিশন—তুই ছবিগুলো ফ্রেমিংয়ের
ব্যবস্থা কর।

আসলে, বাত ইয়ে হ্যায়—আমি চাই ক্যালকাটায় আমার
পেইন্টিংগুলো—বলতে বলতে সাগর চন্দ বাংলা হারিয়ে
ফেলছিল।

তুম বেচনে চাহতে হো ?

ইয়ে বাত হ্যায়। আব তো তুম সমঝ গ্যয়ে না তিলক। অওর
থোড়া সা পাবলিসিটি। ইয়ে প্রেস ব্যাগেয়রা সব কুছ তুমকো
হ্যান্ডেল করনে পড়েগা।

ও হম সমঝ গ্যয়ে। বলতে বলতে তিলক ঘাড় হেলাল।

দাদাবাবু, খাবার দেব ?

লাগিয়ে দে—প্রফুল্লর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিলক এটুকু বলে
দিতে পারে। খাবার টেবিলে শাদা, বড় পোর্সিলিনের বওল
থেকে মুরগির ঝোল তুলে নিতে নিতে মীনা বলে, প্রফুল্ল খানা
খুব ভালো পাকায়।

মীনা আর সাগরকে তার নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়েছে তিলক। মাঝে বসার যে বড় স্পেস, যেখানে তার অফিস, সেখানে কার্পেটের ওপরই শতরঞ্চি তোশক পেতে বিছানা করে দিতে পেরেছে প্রফুল্ল। ডগি, রকি, গোল্ডি—কুর‍্যারিয়ার সার্ভিসের ঘরে। প্রফুল্ল রান্নাঘরের মাচায়।

রাত হয়েছিল আড্ডা দিতে দিতে। এখন বিছানায় শুয়ে মীনা তার জীবনের আলোছায়াটুকু দেখে নিতে পারছিল। সে তো কত বছর হয়ে গেল, আমি তিলকের মডেল ছিলাম। আবার সাগরেরও। নিজে ছবি আঁকতে আঁকতে মন চলে গেল কপির দিকে। বীণা ভার্গব, অমৃতা শেরগিল, কপি, কপি, কপি। অনেকেই কপি-কাজ চাই। নিজের অরিজিন্যালিটি নষ্ট। সবাই বলে, নাম্বাব টু বানাও। ফেক্ তৈরি কর।

বাইরে, রেলিংয়েব অনেকটা নিচে রাস্তার ওপর দিয়ে বুঝিবা কোনো ট্যাক্সি চলে গেল। সাগর তো একেবারেই সিস্টেমেটিক নয়, ছবি আঁকল তো পর পর আঁকল। নইলে নয়। এজেন্সির কাজ কিছু কিছু আসে। ফরমায়েশি জব। দিলেই পয়সা। আমি করি, সাগর করে। কিন্তু ঐ যে বললাম, সাগর একেবারেই মেথডিক্যাল নয়, ফলে কাজ হাতছাড়া হয়। পার্টি রাগ করে। বিরক্ত হয়। বাজারে বদনাম হয়ে গেছে। দিল্লি ভীষণ প্রফেশনাল।

আজ মীনার কিছুতেই ঘুম আসছে না। জীবন তো এ-ভাবেই গড়িয়ে গেল। উঠে, খাটের ওপর বসে একটা সিগারেট জ্বালাল মীনা। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় বদলানোর পরও সমস্ত শয্যা জুড়ে তিলক চৌধুরীর গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মীনা টের পেল।

খুব স্বচ্ছ ড্রেসিং গাউনের আড়ালে নিজেকে বাথরুমে নিয়ে যেতে যেতে মীনা দেখতে পেল তার শরীরকে অনেকখানি-জানা একজন পুরুষ কত অসহায়ভাবে, একলা, দূরে অন্ধকারে চিত

হয়ে ঘুমোচ্ছে। মীনা তো তাকেও ভালোবাসে।

বাথরুমে ফ্ল্যাশ টানার শব্দে ফিকে হয়ে এলো তিলকের ঘুম। বাথরুমের চিলতে আলোয় সে বুঝি রেমব্রাঁর আঁকা কোনো নারীকে দেখতে পেল। বড় দীর্ঘশ্বাস, গোপনে, বুকের গভীরে নামিয়ে রাখল তিলক।

ছবি সব মাউন্টিং করে, ফ্রেমিং করে এসে গেছে। টাইপকরা কাগজে ছবির ক্যাপশান, দাম—এ সবই ফেভিকল দিয়ে কোরা ফ্রেমের গায়ে সেঁটে দিচ্ছিল প্রফুল্ল। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে নয়, 'সংস্কৃতি'—তিলকের নতুন গ্যালারিতে সাগর চন্দ—দিল্লিপ্রবাসী বাঙালি শিল্পীর ছবি ঝুলবে। ইনোগরেশন, প্রেস কনফারেন্স, ব্রোশিঅর, নিমন্ত্রণের কার্ড ছাপানো, তা বিলি করা—সবই তিলক চৌধুরীর দায়িত্বে।

এগজিবিশনে তেমন ভিড় নেই। ছোট বড় মিলিয়ে খান-তিনেক ছবিতে ইংরিজিতে বড় বড় করে 'সোল্ড' লেখা কাগজ লাগিয়েও ছবি বিক্রি করা যাচ্ছে না। বাঙালি তো এখনও সেভাবে ছবিমনস্ক হলো না।

সাত দিনের প্রদর্শনী। দিন যাওয়ার সঙ্গে সাগরের বিরক্তি বাড়ছিল। পাঁচ দিন কেটে যাওয়ার পর খালাসীটোলায় ভরপুর মদ্যপানের পর সাগর রাতে বাড়ি ফিরল না।

মীনা জেগে থাকে। একলা, বিছানায়, অন্ধকারে।

বাইরের ঘরের ওপেন স্পেসটিতে তিলক।

তারা কেউই কোনো কথা বলতে পারছিল না। মাঝে অনিশ্চয়-তার পাঁচিল ছিল। ঘুমে আবার ঘুমে নয় এমন তন্দ্রার ভেতর খাটে একলা মীনা নিজেই নিজের ফরসা উরু দেখে শিউরে উঠেছিল অন্ধকারে। ঘুমের ভেতর শরীর কখন যে এলোমেলো হয়ে যায়। নিজেকে ঠিকমতো গুছিয়ে নিয়ে শুতে শুতে মীনা

চতুর্বেদী নিচের রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া কোনো ট্যাক্সির শব্দে চমকে উঠল।

তিলক ততক্ষণে মেঝেয় নিজের বিছানায় অন্যদিকে কাত ফিরতে পেরেছে।

বারো

একটি মাঝারি সার্কুলেশনের বাংলা দৈনিক ছাড়া কোনো কাগজেই সাগর চন্দের ছবির রিভিউ বেরোয়নি, এগজিবিশন চলতে চলতে। বিষাদ, বিষণ্ণতায় সাগর নিজেকে ভেতরে ভেতরে ক্ষইয়ে ফেলছিল। —আমার কিছু হলো না। কই! একটা ছবিও তো কেউ নিল না। সবগুলো ইংরেজি ডেইলি, অফসেটে ছাপা বাংলা, ইংরেজি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, তারা তো কাউণ্টই করল না আমার কাজ। অথচ সবাই কথা দিয়ে গেছিল তিলককে।

ভাবতে ভাবতে আরও গভীর, গভীর হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল সাগর চন্দ। আমার বাবা আনন্দ চন্দ ছিলেন পোর্ট্রেট পেইন্টার। মানুষের মুখ এঁকে তাঁর রোজগার ছিল। আমি কখনও কখনও চেষ্টা করেছি, বাবার মতো পোর্ট্রেট হয় নি। ফিগারে, ফিগারে, মুখে ভাঙচুর হয়ে গেছে। বাবা এজেন্সির কাজও টুকটাক করতেন। কিন্তু অভাব আমাদের পেছন ছাড়ত না। আমরা অনেকগুলো ভাইবোন।

কি রে ইয়ার! পেপারওয়ালে লোগ, সবাই তোর কাছে ওয়াদা করল, খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে রিভিউ। আমি তো গাধা বেচকে শুয়ে গেলাম! সাগর অস্থির, কাঁপা আঙুলে একটা সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে—যেমন চেইন স্মোকাররা করে থাকে, নিজের ঠোঁটের আগুন নিভতে দেয় না—সেভাবেই সাগর এমন জিজ্ঞাসায় যেতে পারছিল।

কি ইয়ার, বেকার বেকার এত স্মোক করছিস। সারা রাত খাঁসবি তুই! বলতে বলতে মীনা সাগরের মুখ থেকে সিগারেটটি বুঝিবা ছিনিয়ে নিতে চায়। নিজে তো ঘুমোবিই না, অন্যকেও ঘুমোতে দিবি না।

সাগর সরে গিয়ে বলে, আঃ! হট!

তিলক বলে, তুই চিন্তা করিস না। ডোণ্ট ওরি। রিভিউ যাতে তাড়াতাড়ি বেরোয় তার ব্যবস্থা আমি করছি। আজই টেলিফোন করব, দু-একটা জায়গায় নিজে চলে যাবে।

এই ঘরে বসে বসে, ডগি, রকি, গোল্ডিকে দেখতে দেখতে মীনার তার নিজস্ব পমেরিয়ানটির কথা মনে পড়ে। মায়ের কাছে, লোদীনগরে, সিণ্ডেরেলা আছে। নিচু সোফায় হাঁটু মুড়ে বসতে বসতে মীনা ডাকে—প্রফুল্ল প্রফুল্ল! আমাদের একটু চা দে।

তেরো

কলকাতায় বর্ষা বেশ জমিয়ে এসেছে। সাগর দিল্লি ফিরে যাবে। আরও দুটো ইংরেজি ডেইলি আর একটা বাংলা ডেইলিতে তার এগজিবিশন রিভিউ আছে। ভালো ভালো কথা কিছু লেখা আছে। কাটিংসগুলো দেখতে দেখতে সাগরের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কলকাতায় এই তার প্রথম সোলো এগজিবিশন। সাগর এবার দিল্লি চলে যাবে। বড় কিছু ছবি থাকবে তিলকের হেফাজতে। তিলক বিক্রির চেষ্টা করবে। না হলে ক্যারিং কস্ট পড়ে যাবে অনেক, অনেক টাকা। এমনিতেই বেশ কিছু ধার হয়েছে সাগরের।

তিলকের ফ্ল্যাটে কয়েকটা দিন থেকে যাব—এমন প্রস্তাব সাগরকে দিয়েছিল মীনা। সাগর চুপ করে ছিল। তাদের বিবাহ-বন্ধনহীন দাম্পত্যের শর্তই তো একে অন্যের ব্যাপারে ইণ্টারফেয়ার না করা।

ঘরে আবছা আঁধার ছিল। সাগর কাল চলে যাবে। টিকেট কাটা, রিজার্ভেশন—সব হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। টেলিফোনে অমৃতলালের সঙ্গে কথা বলছিল তিলক—সেই গ্লাস পেইন্টিংয়ের দশ মহাবিদ্যার ব্যাপারে। হুবলালকা খুব চাপ দিচ্ছে। টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। টেলিফোনে কথা বলতে বলতে তিলক দেখতে পাচ্ছিল কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, বগলা, সিদ্ধেশ্ববী, কমলা—সবাই অজস্র টাকার মালা পবে তার চারপাশে গ্লাস পেইণ্টিংয়ের ফ্রেম থেকে নেমে এসে ঘুরছে। ঘুরছে। তিলক এই ঘরের বাতাসে টাটকা নোটের গন্ধ পাচ্ছিল।

. দেখছি। আমি দেখছি। বলে মালটার ব্যাপারে আরও খানিকটা ক্রেজ তৈরি করে তিলক রিসিভার নামিয়ে রাখল। তার পবনপুত্র ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্যুরিয়ার সার্ভিসে সুসান জর্জ এসে বসে গেছে ক্যাশ রিসিভিংয়ে। ভেতরে পীযূষ। সুবিমল তার মাচায়, টেবিল-আলোটি জেবলে। তার একফালি নিয়মমতো পড়েছে সামনের বাথরুম-স্পেসে। কার্পেটের গায়ে খানিকটা। গোটা ঘর-জুড়ে ডগি, রকি, গোল্ডির গায়ের গন্ধ।

এ-ঘরে মীনার প্রিয় ব্র্যাণ্ডের সিগারেট তার দহনের ঘ্রাণটুকু বাতাসে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিল। সাগর চলে গেছে দিন পনের। আজ আকাশ মেঘে মেঘে সেজে আছে। ঘরে জোরালো আলো ছিল। ক্যানভাসে, টার্কিশ ব্লুর জমিতে, শাদা-হলুদ রেখায় তৈরি, অনেকটা বুঝি ফোক ফর্মের আদলে মীনা চতুবে দী যামিনী রায় হয়ে উঠতে চাইছিল। একটু দূরে নিঃশব্দে বসেছিল রকি, ডগি, গোল্ডি।

পাশে অরিজিন্যাল ছবি। মীনা তা থেকে অন্য একটি ক্যান-ভাসে এর হুবহুটি তুলে ধরছিল। ছবি আঁকার সময় পাখা বন্ধ থাকে। প্যালেট, তুলি, রং, ব্রাশ—সবই ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে ছিল, নৈনিত্তর। ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে মাঝে মাঝেই ধোঁয়ায় নাক-

মুখ কুঁচকে নিচ্ছিল মীনা। তারপর তার লম্বা লম্বা আঙুলে, সাজানো সুন্দর নখের পাশে, ডান হাতের অনামিকায় যে শাদা আমেরিকান ডায়মণ্ডটি আছে, তাতে আলো পড়ে চমকে উঠছিল। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছিল মীনা। তার আগুন-আলোটি হয়ত শাদা নাকছাবির পাথরে।

ঘরের কাঠ আর দড়িতে তৈরি হাল্কা, বেঁটে চেয়ারে চুপ করে বসেছিল তিলক। তারও হাতে সিগারেট। তিলক তার দিল্লির প্রিয় নারী মীনা চতুর্বেদীর বয়েজ কাট চুল, চওড়া পিঠ, ভারি নিতম্ব দেখতে পাচ্ছিল। মীনা তাহলে পারে, আগের মতোই কপি করতে। তিলকের চোখে যামিনী রায়ের ছবির টাকারা ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল।

মীনার তুলিতে, ক্যারিশমায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যামিনী রায়।

যামিনী রায়! ওহো, অনেক যামিনী রায়! মানে অনেক, অনেক টাকা। সব, সমস্ত অ্যাণ্টিক, আর্ট অবজেক্ট আমি কিনে নেব। উত্তেজনায় তিলকের কপালে ঘাম জমছিল। রেখায়, অবয়বে, রঙে, তার সামনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল যামিনী রায়ের আঁকা ছবির নিখুঁত কপিটি। মীনা তেমনই ঘোরে ছিল। সৃষ্টির উন্মাদনায়।

হঠাৎ ফোন বাজল। হাঁটু অব্দি হাফ-প্যাণ্ট আর স্পোর্টস গেঞ্জি পরা শরীর নিয়ে সামনে অল্প ঝুঁকে তিলক তার ঘরের রিসিভারের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। মীনা চমকে, একটু যেন নড়ে বসেই নিচু গলায় জিগ্যেস করে, কোন্ ইয়ার! কিসকো টেলিফোন? সাগর!

কলকাতায় এসে, এখানকার জলে আমি কি একটু কালো হয়ে গেছি। কনুইয়ের অনেকটা ওপর অব্দি হাউসকোটের লেস-বসানো হাতার পর যে বাহু-ভূমি, তার রঙে বুঝিবা কোনো কালিমা-কোটিং। হয়ত কলকাতার জলেই।

গায়ের সেই রঙের দিকে তাকিয়ে মীনার বুক ভাঙল দীর্ঘশ্বাসে। আর তার আবারও মনে পড়ল সাগরকে।

সে ফোনের কথোপকথন শোনার জন্যে কান খাড়া করে রইল। নাহ্, সাগর নয়। টেলিফোন সেরে ফিরে তিলক দেখতে পেল মীনা নিশ্চিন্তে যামিনী রায়ে ডুবে আছে। তার পিঠে, কাঁধে কোমরে তেমনই ঘরের অকৃপণ আলো। ক্যানভাসে যেনবা যামিনী রায়ই এঁকেছেন, এমন বেড়াল ফুটে উঠছিল বড় ধীরে।

খুব সকালে জেগে ওঠে কাশী। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছাকাছি এক হোটেলের দোতলায় বেশ ভোরেই ঘুম ভাঙল তিলকের। কাল রাতে খানিকটা ভাঙ নিয়েছিল তিলক। সঙ্গে কাশীর চমচম। মালাই। ভাঙের সবুজ গুলি গোটা দুই নেয়ার ঘণ্টাখানেক পর থেকেই গোপাল দাস বলছিল, কলকাতায় ফিরে সমস্ত আর্ট কালেক্টর আর দালালকে সে দেখে নেবে। ঘোষ, মিত্তির, মুখার্জি—কাউকে বাদ দেবে না। ভাঙ খেলে মাঝে মাঝেই মাথার ভেতর দপ দপ করে হাজারটা আলো এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে। তারপর নিভে গিয়ে গভীর অন্ধকার। তখন আর সেই অন্ধকারের বাইরে বেরনো যায় না। কাল কী করব, সেই প্ল্যান বানানো যায় না। তিনদিন আগে কী করেছিলাম, তাও মনে পড়ে না। বুত্ হতে হতে একেবারে মস্তু। শুয়ে পড়লে মাথার ভেতর অনেকগুলো কাচের রঙিন গুলি গড়িয়ে যায়। তারপর এক সময় চুর চুর হয়ে ভেঙে গেলে সেইসব ভাঙা কাচ মাথার ভেতর বিঁধে যেতে থাকে। আর তখনই স্মৃতির কোনো কোনো আবছা ছবি উসকে ওঠে। মীনাকে মনে পড়ে যায় তিলকের। বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই তার মনে হয় ঝপ করে অনেকটা নিচে আছড়ে পড়ছে, বাতাসের গদীর ওপর। তারপর শক্ত মেঝেয়। একবার, দু বার, তিন বার।

বেনারসে তিলকের সঙ্গে তিন পুরুষ—ডাকি, রকি, গোল্ডি

এসেছে। কাল বেনারস পেঁছেই এখানকার সবচেয়ে বড় অ্যান্টিক ডিলার শ্যামচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা হয়েছে তিলক চৌধুরীর। দশাশ্বমেধ থেকে গোধুলিয়ার দিকে যেতে বাঁ হাতে শ্যামের অ্যান্টিক শপ। রাস্তা থেকে বেশ নিচে। শ্যাম থাকে হাতি ফটকায়। নিজেদের পাথরের দেয়ালের পুরনো বাড়ি। দুই ছেলে শ্যামের। বউ। বাবা-মা গত হয়েছেন।

তামাটে পোড়া চেহারা. এক গাল কালো দাড়ি। মাথার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে গেছে। রোগা হাড় হাড় শরীরে ধুতি। তার ওপর পাঞ্জাবি। বাঙালি পোশাকে শ্যামচন্দ্র সকাল বিকেল দোকানে। রামনগর রাজাদের কালেকশনের কিছু কিছু। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আর বনেদি বাড়ির এটাসেটা। অযোধ্যা, নেপাল, এলাহাবাদ—সব নেটিভ রাজাদের জিনিসপত্র। পুরনো ম্যানসক্রিপ্ট, পুথি। ছোরা, মূর্তি, পোশাক, কোমরবন্ধ।

তিলক খবর পেয়েছে লক্ষ্ণৌয়ের একটা বড় কালেকশান শ্যামের হাতে এসেছে। সেজন্যেই আসা। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি আরও কিছু সওদা হয়। সঙ্গে গোপাল দাস আছে। আর তিলকের তিন বডি গার্ড—ডকি, রকি, গোল্ডি।

ভাঙে কি এক জড়তা ছড়িয়ে যায় শরীরে। তিলক তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

বিশ্বনাথ গলির মুখে দুপুর বেলা হাঁটতে হাঁটতে পল্টন দত্তর সঙ্গে দেখা। একটু যেন চিন্তিত—এভাবে পল্টন হাঁটছিল। তিলক কাশীর বিখ্যাত কাঠের খেলনার সেট কিনতে চাইছিল বেশ কয়েকটা। ব্যান্ড পার্টির সেটই। রাধাকৃষ্ণ। নানা চেহারার পাখি। হাতি, উট, বাঘ, ঘোড়া। ছোট-বড় নানা সাইজের। এরপর তো এরাও অ্যান্টিক হয়ে যাবে, তিলক তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছিল।

কাঠের খেলনার সেই সুক্ষ্মতা আর নেই। কারিগররা অনেকেই এখন রিকশাঅলা। কাঠের পুতুল বানিয়ে পেট ভরে না। কাস্টমার

রঙচঙে প্লাস্টিকের পুতুল চায়। তিলক এসব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। গোটা দুই যা সেট পাওয়া গেছে, তা তার মনের মতো নয়। এভাবে কি সবই অ্যান্টিক হয়ে যাবে!

গোপাল সঙ্গে ছিল। গোপালই বলল, পল্টনবাবু।

সামান্য চমকে সেদিকে তাকাল তিলক।

সরু গলির মুখে পল্টন। মুখোমুখি আটকে গেছে। তিলক তাকিয়ে দেখল সেই গোল হাতা ঢিলেঢালা আদ্দির পাঞ্জাবি। ধুতি। পায়ে হরিণ চামড়ার চপ্পল।

পল্টনদা—তিলক সহজ হতে চাইল।

আর তিলক যে—পল্টন যেন বা আহ্লাদে গলে যাচ্ছে।

তবে কি পল্টনও কোনো বড ডিলিং-এর খোঁজে! রামনগরের মহারাজা? লক্ষ্ণৌয়ের কোনো নবাব—তিলক মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

কোথায় উঠেছ?

এই কাছেই, দশাশ্বমেধ লজে। এখন তো আর কল্যাণাক্ষদের 'হরধাম' নেই। একটু আউটস্কার্ট। হয়ত মেইন সিটি থেকে সামান্য দূরে, তবু শান্তি ছিল বাবা। আমাদের ছেলেবেলায়, কৈশোরে, যৌবনে, কত বার হরধামে। আর কাশী এলে কল্যাণাক্ষ-তো যেতেই চাইত না। ও বিশ্বাস করে, কলকাতা নয়, এটাই ওর প্রকৃত শহর। আর হরধাম ছাড়, সে নয় একটু একটেরে, কিন্তু গোধূলিয়া, বিশ্বনাথ গলির কি অবস্থা! পাঁড়ে ধরমশালা, হর-সুন্দরী ধরমশালার কাছে কোথায় সেই বিখ্যাত দুধের বাজার! টাঙার আড্ডা! খালি দোকান। চাটের দোকান। হরিবল্। আর ভিড—উফ।

কি করছে তোমার কল্যাণাক্ষ এখন? তিলক পল্টনকে প্রসঙ্গান্তরে আনতে চাইল।

'বসুমতী' থেকে রিটায়ারমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে, চাকরি ফুরোবার আগেই। এখন রামকৃষ্ণ বিষয়ে একটা গবেষণা কেন্দ্র খোলার জন্যে

জমি খুঁজছে। কামারপুকুর, জয়রামবাটি করে বেড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। থাকেও গিয়ে কয়েকদিন করে। জয়রামবাটিতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে, মামার বাড়ি গেছিলাম।

আজ বিকেলে কি করছ? এসো না, বসি। অনেক দিন তোমার সঙ্গে 'ক্লাস', 'লেখাপড়া' হয় না। ভালো স্কচ আছে একটা। আজ সন্ধের দিকে একটু সন্ধে-আহ্নিক—

আজ সন্ধেবেলাতেই! পল্টন জিজ্ঞাসায় গেল।

ক্ষতি কি, তোমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

না, সেরকম কিছু না। বসা যাবে।

আসলে তিলক চৌধুরী পল্টন দত্তকে আটকাতে চাইছিল।

গোপাল দাস আর তিলক হোটেলে ফিরে এলো। রকি, গোল্ডি, ডগি ঘরের ভেতর ছাড়া ছিল।

সন্ধের আড্ডায় স্কচ ছিল। ভাজা মেটে।

এক রাউন্ড হওয়ার পরই পল্টন উত্তর কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজের ভাষা শোনাচ্ছিল। অদ্ভুত ভোকাবুলারি, বুঝলি! যেমন ধর, 'পেচারি' মানে ভিতর বাড়ি।

তিলক লক্ষ করছিল পল্টন কখনও 'ভেতর' বলে না।

'লোক' মানে চাকর। 'মানুষ' হলো গিয়ে দাসী। 'লাশ' মানে মৃতদেহ। 'সাজা' হলো বাথরুম। মিষ্টিকে বয়স্করা বলবেন 'মিটি'। একটা মিটি নিন, এমন অনুরোধ! বৌদি, বৌঠানের বদলে 'বৌমণি'। প্রণামকে 'দণ্ডবত'। যেমন ধর, 'শ্বশুরঠাকুরকে দণ্ডবত'। চকোলেট সন্দেশকে বলবে, 'কোকোজাম'। খাওয়াটাও খানিকটা পিকিউলিয়ার। মৌরির চা খুব ডিলিশাস মনে করে। শশা কুচি, মুগের ডাল ভেজানো, ভিনিগারে ডোবানো আদাকুচি—এসবই থাকে নেমন্তন্ন বাড়িতে। তারপর মাছ-মাংসের বদলে হয়ত ঝুনোঝুনি করবে বাড়ির কর্তারা—'দুটো আলুভাজা নিন। নিন না। নিন দুটো আলুভাজা।'

রবীন্দ্রনাথ মদ্যপান করতেন না তিলক, বুঝলে। কিন্তু এক

চামচ করে জাস্টিনিয়ন ব্রুক খেতেন রোজ। পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ছিল পাখি পোষার শখ। তাঁর পাখিদের যিনি দানা যোগাতেন, তাঁর নাম সোনাউল্লা। আবার 'যন্ত্রকোষ' নামে বইয়ের লেখক শৌরীন্দ্রমোহন মহাকচ্ছপী বীণা বাজাতেন। তার মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টস-এর বিশাল কালেকশান-এর অনেকটাই এখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে।

শেষ জীবনে শৌরীন্দ্রমোহন যা করতেন, তার পেছনে যুক্তি হিসেবে বলতেন, সরস্বতী বলছে।

তুমি কি জান, কলকাতার বহু বনেদি পরিবারের মেয়েরা সন্ধেবেলা পাছায় আলতা মেখে, সায়া ছাড়া শাড়ি পরে তাঁদের স্বামীদের জন্যে অপেক্ষা করতেন!

এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে খুব দ্রুত চলে যেতে পারে পল্টন। আর কত যে জানে।

গ্লাসে আবারও বড় করে চুমুক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আনানো জন প্লেয়ারের সেলোফেন খুলে ফেলছিল পল্টন। তিলক বুঝতে পারল লিটন দিয়েছে। বাংলাদেশরই দেশলাই 'ল্যান্সার'। তা দিয়ে পল্টন সিগারেট ধরাল। এই ধর বাংলাদেশ। সব গাড়ি জাপানি হিনো কোচ। নিজেদের কিস্যু নেই। বলতে বলতে কখন যেন হ্যাণ্ডনোট প্রসঙ্গে চলে যেতে পারে পল্টন।

তিন রকম হ্যাণ্ড নোট হয় ছোকরা, বুঝলে! রুমালি, সিল্ক, রেশমি। রুমালি হ্যাণ্ডনোটে একশো টাকা লিখলে বারোশ টাকা অব্দি পেমেণ্ট দিতে হয়। একশো টাকায় ম্যাক্সিমাম চার হাজার আটশো টাকা অব্দি উঠেছে সে যুগে। লাহাবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, সেনবাড়ি, দত্তবাড়ি, শীলবাড়ি—সব বাড়ির কাপ্তেন-রাই হ্যাণ্ডনোটে গেছে। দেদার খরচা করেছে। উড়িয়েছে।

এই যে আমি, দ্যাখো না। খাস চাকর ছিল দুটো। সকালে বিছানা থেকে উঠলে ঘরে পরার জুতো ঘুরিয়ে রেখে যেত পায়ের কাছে। না হলে বিছানা ছেড়ে নামতে পারব না। আর এখন

দ্যাখো, টম ডিক হ্যারির মতো ট্রামে-বাসে গুঁতোগুঁতি। সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়া। 'ব্লু বার্ড', নয়ত 'জেনারেল' সিগারেট। কোথায় গেল নীলরক্ত! ঐ যে সুভোদা লিখেছিলেন না, নীলরক্ত লাল হয়েগেছে।

তিলক বুঝতে পারছিল পল্টনের চড়ে গেছে। আর তাকে 'তুমি' করে বলছে।

অ্যাই গোপাল, হুইস্কি ঢাল। বেয়ারা, ক্লাব সোডা। বলতে বলতে পল্টন নতুন করে সিগারেটে যাচ্ছিল।

মহাকচ্ছপী বীণার একটা কত দাম জান? এখন? ফুঃ, জানো না। তুমি করবে অ্যান্টিক ডিলিং! ফুঃ। খোকা সব। জানো, কমল হিরে আর পদ্ম হিরের মধ্যে ফারাক কি! জানো না।

জানো আর্টিস্ট, স্কালপটার, কুস্তিগীর, শিকারি, গল্পকার দেবীপ্রসাদের বাড়ি আড্ডা দিতে গেলেই সন্ধেবেলা ফ্রি মদ পাওয়া যেত। চারমিনার সিগারেটে গোটা তিন চার টান দিয়েই বাড়িতে রাখা কোনো পাত্রের ভেতর বালির মধ্যে গুঁজে দিতেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী বিশাল, বলশালী মানুষ।

কথা বলতে বলতে পল্টনের চোখে জল কাটছিল। মাথা ঝুলে আসছিল সামনের দিকে।

এইসব লেখ না পল্টনদা। বই হলে ভালো বিক্রি হবে। তিলক মনে মনে ভাবছিল। আর তখনই কেমন যেন জলতল থেকে উঠে আসা মীনার মুখ বুঝি বা মনে পড়ে গেল তার, একবার ক্ষণিকের জন্যে। মীনার চোখে জল। নতুন করে হুইস্কিতে সোডা মেশাল তিলক।

পল্টনের ঘাড় ততক্ষণে ঝুলে পড়েছে।

শ্যাম ভট্টাচার্যের দোকানের গর্ভগৃহে আড্ডা দিচ্ছিল গোপাল আর তিলক। একটা ডুয়েল লড়াইয়ের পুরনো পিস্তল পাওয়া

গেছে। দুটো বড় ড্যাগার। তার হাতলে বার্মিজ রুবি আছে।

হাতে লেখা রামায়ণ-এর কিছু রেয়ার ম্যানসক্রিপটস দেখাচ্ছিল শ্যাম। দূরে দশাশ্বমেধের গায়ে গঙ্গার বুকে তখন সন্ধে নেমে আসছে।

ইলাসট্রেটেড রামায়ণ। পাতায় পাতায় হাতে আঁকা রঙিন ছবি। কাঠ দিয়ে বাঁধানো। সেই কাঠের ওপরেও ছবি—হাতে আঁকা, রঙিন। শ্যামের পাথর গাঁথনির দেয়ালের বাড়িতে তয়খানা আছে। সেখানে বহুযুগ আগে গুমখুন হতো। শ্যাম জিনিস দেখানোর ফাঁকে এইসব গল্প করছিল।

তিলক, গোপাল বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল। এর সওদা কত? তিলকের হাতে রামায়ণের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি।

দশ হাজার। শ্যামের গালে কোনো ভাঁজ পড়ল না কথা বলতে।

আর তারপরই কোনো নেটিভ রাজার তলোয়ার ঝোলানোর কোমরবন্ধটি দেখিয়ে তিলককে প্রায় পেড়ে ফেলল শ্যাম। সোনার সুতোর কাজ। সঙ্গে দামি পাথর। যে কোনো রইস মাড়োয়ারি পরিবারে মেয়ের কাছে ফ্যানসি প্রাইসে হাল ফ্যাশানের জিনিস হিসেবে বলে বেচে দেয়া যাবে। এখন মেয়েরা কোমরে খুব চওড়া বেল্ট পরছে।

কিন্তু সেই নেটিভ স্টেটের রাজার কালেকশান! এমন ভাববার ভেতরই তিলক চৌধুরী বলে উঠল, কত?

বাইশ, বাইশ হাজার। শ্যাম হাসছিল।

তার দোকানের দেয়ালে বড় বড় অনেকগুলো আয়না। শিং সমেত হরিণের মুণ্ডু। তার চোখে সবুজ কাচের গুলি। এক কোণে স্তূপ করা পুরনো পুঁথি। দু চারটে মন্দিরের বড় ঘণ্টা। ভাঙা।

নানা কথা বলতে বলতে শ্যাম দাড়ি চুলকোচ্ছিল। আর তখনই পল্টন এসে ঢুকল দোকানে। হাতে জ্বলন্ত জন প্লেয়ার। ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে হরিণ চামড়ার চটি।

পল্টন তিলক আর গোপাল দাসকে দেখে বলল, তোমরা !

তিলক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোসো বোসো। কাল রাতে রিকশাঅলা ঠিকমতো নিয়ে গেছিল তো !

আরে জে এম টি টি বাবা, জাতে মাতাল। তালে ঠিক। ভুল করছিস কেন ? তো কি কিনলি ?

কিছু না। দেখছি।

আর কি বেচলি ?

একথায় তিলক একটু যেন চমকে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বেচব কি ! আমি কি বেচি !

পল্টন ততক্ষণে নিজের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে আরও একটি নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিতে পেরেছে। সঙ্গে ঘং করে কেশে ওঠা।

দূরে গঙ্গার বুকে সূর্য মুছে গেল। দশাশ্বমেধ থেকে ডান দিকে রামনগর যাওয়ার পনটুন ব্রিজের ওপর তখন অনেক অটো-রিকশা।

কলকাতায় বৃষ্টি বুঝি ফুরিয়ে এলো। তবু এই ডোরিক স্থাপত্যের খাঁচার ভেতর থেকে তেমন করে টের পাওয়া যায় না ঋতু বদল। আজ নিয়ে দুরাত, তিলক ফেরেনি। বেনারস গেছে। কোনো নেটিভ এস্টেটের রাজার শেষ চিহ্নটুকু বিক্রি করে দিচ্ছে তার বংশধরেরা। সেই কালেকশানের মোটা একটা বান্ক নিয়ে ফেরার কথা তিলকের। সঙ্গে গোপাল দাস গেছে।

বাড়ি ফাঁকা থাকবে, ক্লায়েণ্টরা এসে ফিরে যাবে, বন্ধ থাকবে পবনপুত্র ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্যুরিয়ার সার্ভিস, কার্নিভাল অ্যাণ্ড এজেন্সি। একা প্রফুল্ল এত সব সামলাতে পারবে না। তার ওপর তেমন ডিপেণ্ড করা যায় না। মীনা আছে। সে সব ম্যানেজ করবে। সুসান আছে। সুবিমল আছে। তাদের

কাজ বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। দায়িত্ব। দায়িত্ব।

মাথার ওপর ফরাসি স্যান্ডেলেয়ার। পাশে কোনো প্রাচীন রাজপুরুষের মদের বাহারি সেলার। কার্পেট। পার্টি। টাকা। ছবির পর ছবির কপি। মীনা ক্রমে যেন হাঁপিয়ে উঠছে।

টাকা আসছে। জিনিস কিনতে পারছি ইচ্ছেমতো। সাগরের মতো কম রোজগার নয় তিলকের। তার আয় অনেক, অনেক বেশি। আমার নিজের নামেও টাকা জমছে।

ম্যাডাম, এই লে-আউটটা, সুবিমল এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে সিগারেট নিয়ে মীনা আনমনা ছিল।

ঠিক আছে। ও কে। পার্টির ডিমান্ড তো এমনই না!

হ্যাঁ। সুবিমল শব্দহীন ঘাড় নাড়ে।

ম্যাডাম, আপনার টেলিফোন! বোধহয় এস-টি-ডি। ফ্রম ডেল্‌হি। সুসান শুধু খবরটি পৌঁছে দিয়ে যায়।

ছুটে, সমস্ত অদৃশ্য বাধা কাটাতে কাটাতে মীনা টেলিফোনের সামনে আসে।

মা।

মীনা, তোর পমেরিয়ান সিন্ডেরেলা, খুব গোলমাল করছে। কব লওট রহে তুম?

মীনা স্তব্ধ ছিল। বড় আশা ছিল ফোনে সাগরের গম্ভীর গলা ভেসে আসবে—হাই মীনা! হাউ আর ইউ! কব লওট রহে হো ভাই? আমার কিছু ভালো লাগছে না। এভরিথিং ইজ ডিসগাসটিং! মীনা, শুনতি হো! লিসন্‌ মীনা—

আমি তো এখান থেকে চলে যেতে চাই সাগর। নিজেকেই নিজে শোনাতে চাইল মীনা।

মা একতরফা কত কী বলে যাচ্ছিল।—কতদিন তোমায় দেখি না বেটা। সাগরও বহুদিন খবর দেয় না। তিলক ক্যায়সে হ্যায়?

ও য়ঁহা নেহি হ্যায় মা। ম্যাঁয় অকেলি হুঁ। অকেলি। লেকিন

ম্যায় আচ্ছি হুঁ মা। আচ্ছি হুঁ। বহুত আচ্ছি।

অনেক কষ্টে নিজের বুকের ভেতর একলা থাকার কান্না আটকাল মীনা।

খুশ রহনা বেটা। খুশ রহনা। মা তো এমন করেই বলতে পারে।

ফোনের ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, এস-টি-ডি-র সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজিতে এমন সতর্কতাবাণী বাজছিল।

ওপারে মায়ের কথা মুছে গেল। রিসিভারে এখন শুধুই যন্ত্রের কোঁকানি।

একা, একেবারে একা দাঁড়িয়েছিল মীনা চতুর্বেদী, কার্পেটে। তার মনে হলো সে বুঝিবা ম্যাজিক-কার্পেটে উড়ে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো কোনো ইউরোপিয় শিল্পীর আঁকা অয়েলপেইন্টিংয়ে ডানামেলা পরী হয়ে, ছবির ফ্রেমে আটকে গেল।

মীনার পায়ের নিচে কার্পেট কেঁপে উঠছিল। এই গোটা ঘর, তার প্রাচীন দেয়াল, ফরাসি ঝাড়, সেলার, পুরনো ফ্যান, ছবি, অ্যান্টিক—সব তাকে পিষে মারতে চাইছিল।

একলা একলা সোফায় থেবড়ে বসে পড়া ছাড়া মীনার আর কিছু করার ছিল না।

———